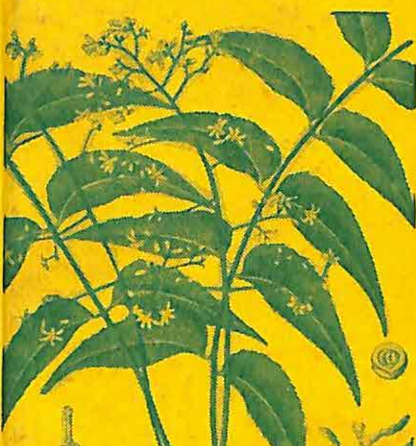
ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ

দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী





বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কলিকাতা

Approved for ISES
[signature] 29/7/89.

ভারতীয় ভেষজ উদ্ভিদ

দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট
কলিকাতা-700 006

‘পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির গ্রন্থ প্রকাশ অনুদান প্রকল্প অনুযায়ী রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত’।

প্রকাশক ঃ
ডঃ সুকুমার গুপ্ত
কর্মসচিব
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ
কলিকাতা-700006

প্রথম সংস্করণ ঃ জানুয়ারী 1962
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ এপ্রিল 1989
গ্রন্থস্বত্ব ঃ বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রচ্ছদ ঃ শৈলী, কোয়ালীটি প্রিণ্টার্স

মুদ্রক ঃ
শ্রীনবকুমার দত্ত
শৈলী, কোয়ালিটি প্রিণ্টার্স
4এ, মানিকতলা মেইন রোড
কলিকাতা-700 054

মূল্য ঃ দশ টাকা

মুখবন্ধ

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে বহু উদ্ভিদ ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অর্থব বেদে, সুশ্রুত সংহিতা, চরক সংহিতা এবং বিভিন্ন কবিরাজি পুস্তকে এর ব্যাপক ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। এইসব পুস্তকে লিপিবদ্ধ উদ্ভিদকে বর্তমানে বহু ঔষুধই সরাসরি কাজে লাগানো হচ্ছে। হোমিওপ্যাথি চিকিৎসায়ে ব্যবহৃত বহু ওষুধ ভেষজ উদ্ভিদ থেকে নিষ্কাশিত করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যাতে এইসব উদ্ভিদের প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারে তার জন্যই বিজ্ঞান পরিষদ এই ধরণের বই আগেই রচনা করেছে। বর্তমান বইটিকে পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত করে নোতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করা হল। এ থেকে সাধারণ মানুষ উপকৃত হলে—পরিষদের উদ্দেশ্য সাধিত হবে।

এই বইটিকে নোতুন ভাবে লেখার জন্য অধ্যাপক দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তীকে ধন্যবাদ জানাই। ডঃ সরোজ বসু ও অন্যান্য পরিষদ কর্মী বইটি প্রকাশে সাহায্য করেন তাঁরাও ধন্যবার্দাহ। পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরকে। এই দপ্তরের অর্থানুকূল্যে এই বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হল।

ডঃ সুকুমার গুপ্ত

কোলকাতা — কর্মসচিব

30শে মে, 1989 — বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

ভেষজ উদ্ভিদ চিকিৎসা-বিজ্ঞানের একটি অনন্যসাধারণ অঙ্গ। ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে দেশজ উদ্ভিদ প্রাচীনকাল থেকেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে এসেছে। ঋগ্‌বেদ, সুশ্রুত সংহিতা এবং চরক সংহিতা প্রভৃতি গ্রন্থ এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেয়। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভেষজ উদ্ভিদ নবরূপ ধারণ করেছে। শুধুমাত্র রোগ-নিরাময়েই নয়, অর্থনীতিক সম্পদ হিসাবেও এই উদ্ভিদ গোষ্ঠীর কতকগুলি বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। আজকের ভারতীয় উদ্ভিদকুলের নব রূপায়ণে বিদেশীয় উদ্ভিদগুলি বিশেষ অংশ গ্রহণ করছে। বর্তমান গ্রন্থে দেশের কয়েকটি গুরুত্বসম্পন্ন উদ্ভিদের কথা, পাঠকদের সামনে উপস্থিত করা হয়েছে। লেখার সার্থকতা হবে পাঠকদের পরিতৃপ্তিতে। সুতরাং এ গ্রন্থের বিচারের ভার রইল তাঁদের উপর।

এই গ্রন্থের অনেকগুলি রচনা প্রবন্ধাকারে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, যুগান্তর এবং লোকসেবক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। এজন্য জ্ঞান ও বিজ্ঞান-এর সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য, যুগান্তরের বাণিজ্য-সম্পাদক শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী এবং লোকসেবকের বিজ্ঞান-সম্পাদক শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু আমার লেখায় সব সময় উৎসাহ দান করেছেন, এজন্য তাঁর প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা নিবেদন করছি। প্রেসিডেন্সী কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যক্ষ ডঃ প্রতুলচন্দ্র রক্ষিত এবং বিজ্ঞান কলেজের রসায়ন বিভাগের খয়রা অধ্যাপক ডঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের কাছে এ গ্রন্থ রচনায় সাহায্যের জন্য

আমি বিশেষ কৃতজ্ঞ। আমার বিদেশ থাকাকালীন এ গ্রন্থ সম্পাদনার দায়িত্ব বহন করেছেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সহ-কর্মসচিব শ্রীরবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, এজন্য তাঁর কাছে আমি ঋণী।

1 জানুয়ারী, 1962
রসায়ন বিভাগ
ব্রাণ্ডাইস বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়ালথাম 54, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র

দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

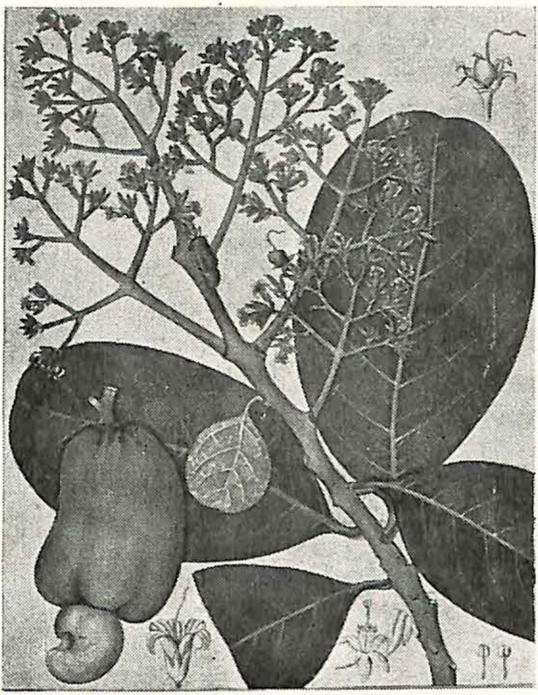
দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বেশ কিছুদিন পর বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ আমার ভেষজ উদ্ভিদ সংক্রান্ত কয়েকটি প্রবন্ধ আবার প্রকাশ করার সিদ্ধান্ত নেওয়াতে প্রবন্ধগুলিতে কিছু নূতন সংযোজনার সুযোগ হয়েছে। নূতন সংযোজনার সঙ্গে সঙ্গে প্রবন্ধগুলি খানিকটা পরিমার্জিত করে প্রকাশ করার সুযোগ আমি নিয়েছি। বর্তমান সংস্করণের সংকলনের সময় আমি অধ্যাপক সরোজকুমার বসু ও জগবন্ধু পাত্রের কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগীতা পেয়েছি সেজন্য আমি তাঁদের আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কর্মসচিব ডঃ সুকুমার গুপ্ত প্রকাশনায় অগ্রণী হওয়ার জন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

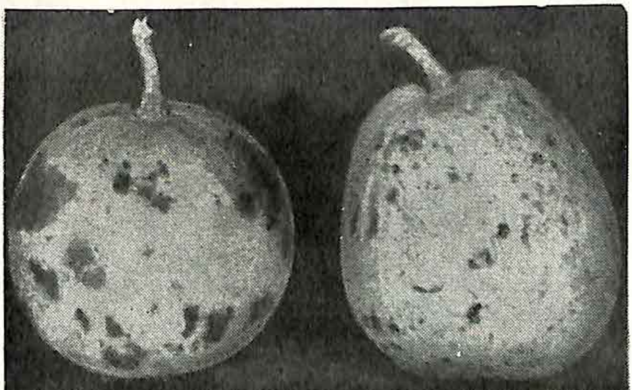
14ই এপ্রিল, 1989
বসু বিজ্ঞান মন্দির
কলিকাতা-700 009

দেবীপ্রসাদ চক্রবর্তী

সূচীপত্র



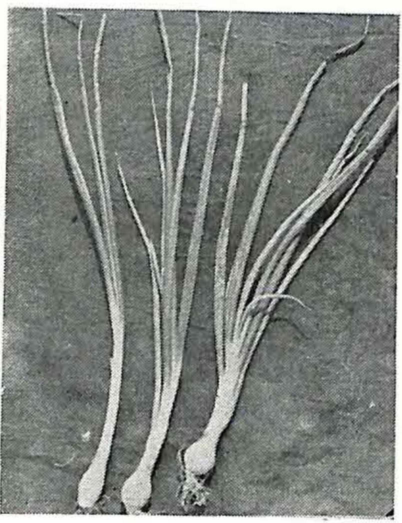
কাজু বাদাম (পাতা, ফুল, ফল)



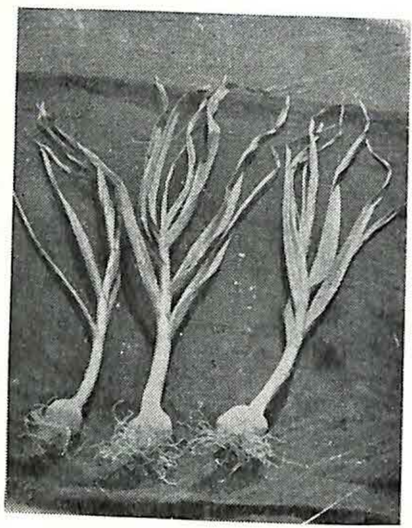
বেল (ফল)



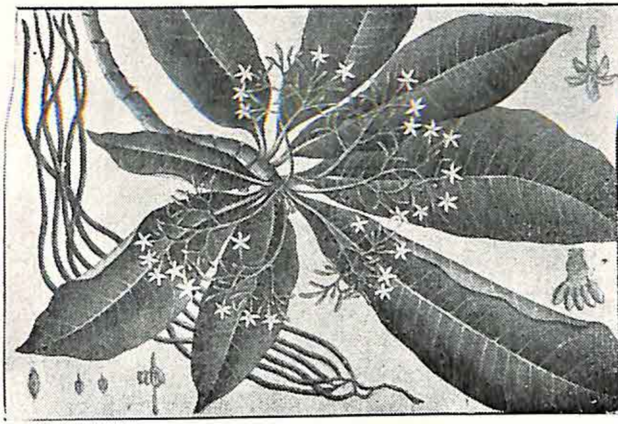
আনারস



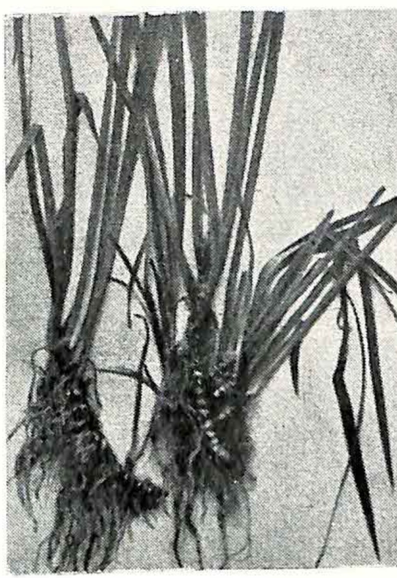
পেঁয়াজ গাছ



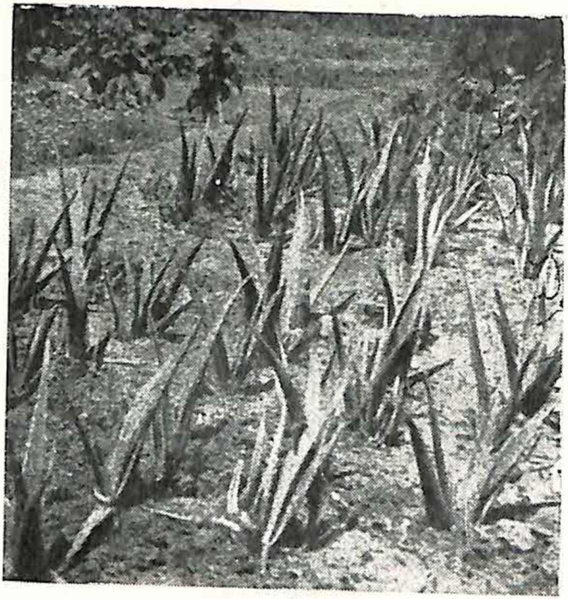
রসুন গাছ



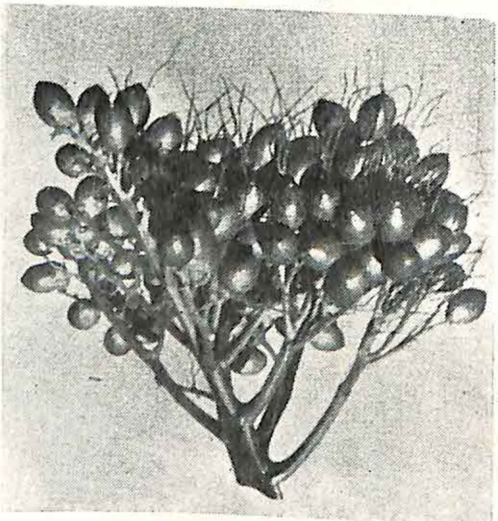
ছাতিম গাছের (পাতা, ফুল)



বচ্



ঘৃতকুমারী গাছ



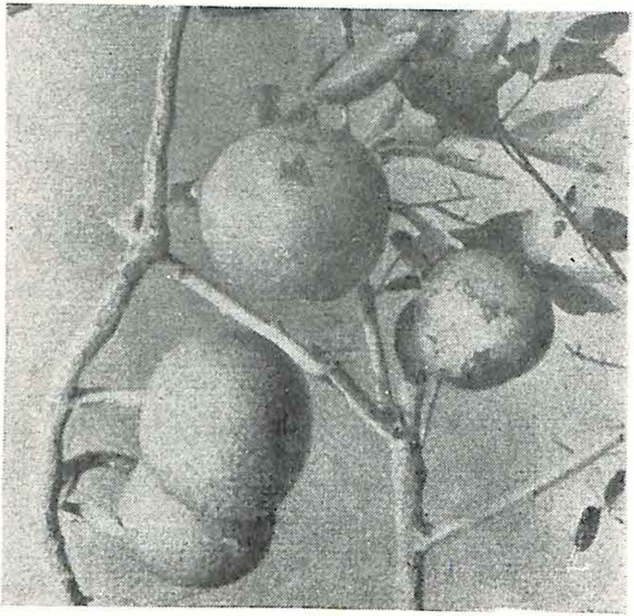
সুপারি (ফল)



খয়ের (পাতা, ফুল, ফল)



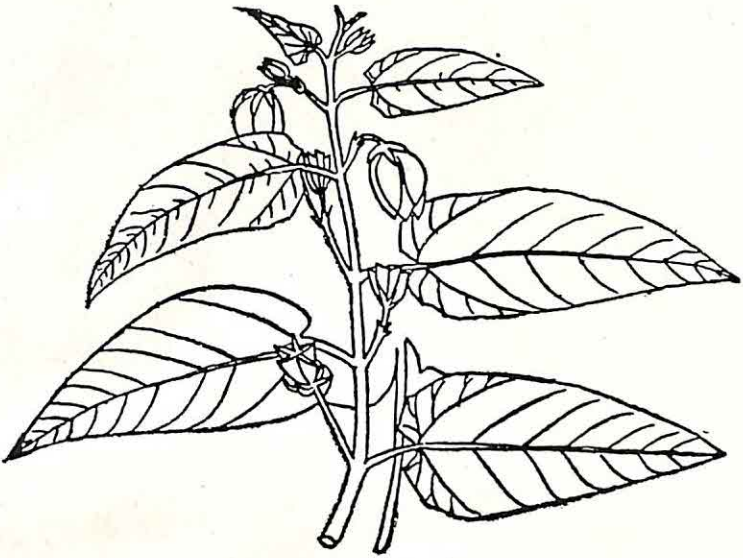
বাসক



বেল (ফল)



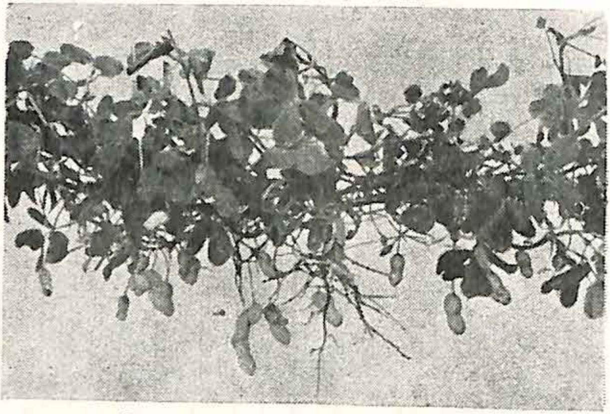
কুঁচ



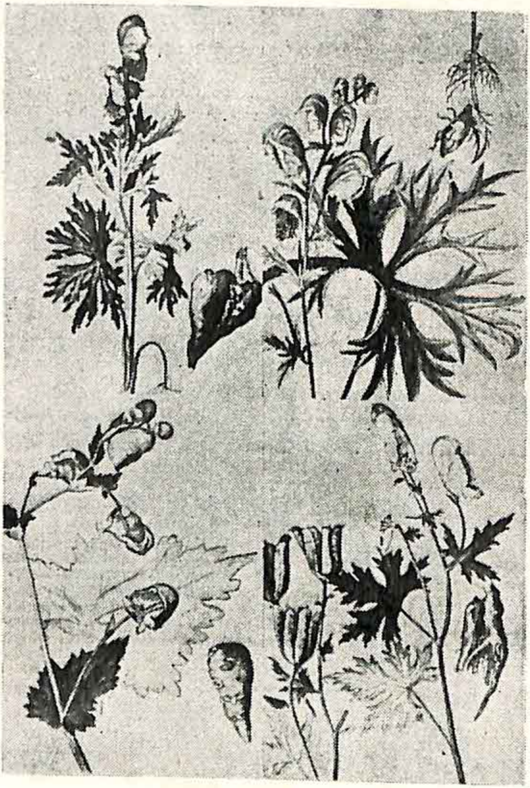
ওলট কম্বল (পাতা, ফল, ফুল)



নিম (পাতা, ফুল)



চীনাবাদাম গাছ (লতান জাতীয়)



অ্যাকেনাইটের বিভিন্ন প্রজাতি

আনারস

আনারসের আদি বসতি ব্রাজিলে। খৃস্টীয় ষোল শতকের আগে আনারস ইউরোপে বা এশীয় দেশে সম্পূর্ণ অজানা ছিল। 1513 সাল নাগাদ আনারস ইউরোপে প্রথম প্রচলিত হয়। ইংলণ্ডে এই ফল প্রথম আসে অলিভার ক্রসওয়েলের সময়। 1688 সালের 19শে জুলাই ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে বারবাডোসের আনারস উপহার দেওয়া হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায়। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরে' আর 'দারাশেকো' গ্রন্থে থেকে ভারতে প্রথম আনারস উৎপাদনের কথা জানা যায়। অবিভক্ত বাংলাদেশে 1594 সালে একজন পর্তুগীজ পর্যটকের সৌজন্যে-আনারস প্রথম আমদানী হয়। ষোড়শ শতাব্দির মধ্যেই ব্রাজিল থেকে আনারস সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় হয়ে ছড়িয়ে পড়ে। এই রকম অল্প সময়ের মধ্যে একটি ফল সারা পৃথিবীতে জনপ্রিয় হয়ে প্রচলিত হওয়া তখনকার দিনের একটা অসামান্য ঘটনা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আনারস অ্যানাসি বা নানাস নামে পরিচিত। সেই থেকে আনারস কথাটি এসেছে। উদ্ভিদবিজ্ঞানে আনারস অ্যানানাস কমোসাস (লিন্) মেরিল বা অ্যানানাস স্যাটিভা সুলট্ এফ [Ananas comosus (Linn.) Merr. *Syn.* A. sativa Schult. f.] নামে পরিচিত। আনারস বহুবর্ষজীবী গুল্ম। পাতাগুলি গোলাপের পাপড়ির মত এক জায়গা থেকে বেরিয়ে আসে ও বর্শাকৃতির হয়। পাতাগুলি 60 থেকে 90 সেমিঃ লম্বা হয়। এর দুধারে কাঁটা থাকে। ফল গাছের কেন্দ্রস্থলে ছোট ছোট পাতাগুলির মধ্যে জন্মায়। ফল যখন পেকে ওঠে তখন দেখে মনে হয় যেন মুকুটের মধ্যে মুক্তার সমাবেশ। পাকলে বেশীর ভাগ ফলের রং হলদে থেকে ফিকে হলদে হয়।

প্রায় নব্বই রকমের আনারস আছে। এগুলোকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা হয়ঃ ক) কুইন খ) ক্যানি গ) ক্যানিস। কুইন শ্রেণীর গুল্মগুলি বেশী শক্ত হয় আর এর ফসল বেশ ভাল হয়। এই ফলগুলি তাড়াতাড়ি পাকে। কুইন শ্রেণীর একটা আনারসের ওজন দেড় থেকে দু' কেজি পর্যন্ত হয়। ক্যানি শ্রেণীর ফল সিংহলে, অষ্ট্রেলিয়া ও হাওয়াই অঞ্চলে প্রচুর জন্মায়। এই ফলগুলির এক একটার ওজন আড়াই থেকে তিন কেজি পর্যন্ত হয়। আরও বড় হয় ক্যানির উপজাতি কিউগোষ্ঠির ফল। ভারতবর্ষে কুইন ও কিউ জাতের ফলের বেশ কদর।

আনারসের চাষের পক্ষে গ্রীষ্ম অঞ্চলের খানিকটা জলো আবহাওয়া বিশেষ সহায়ক। যে সব জায়গায় সারা বছর 127 সেঃমিঃ বৃষ্টি পরিমিত ভাবে হয় সে সব জায়গায় চাষ ভালভাবে হতে পারে। পৃথিবীর নানা দেশে আনারসের চাষ হয়। সবচেয়ে বেশী পরিমাণ জন্মায় হাওয়াই ও মালয় দেশে। এছাড়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ও বাঙ্গলা দেশে বেশ কিছু পরিমাণ ফসল উৎপন্ন হয়। ভারতের আসামে, পশ্চিম বঙ্গে ও পশ্চিম উপকূলে এই ফলের চাষ হয়। যদিও বিভিন্ন ধরনের মাটিতে আনারসের চাষ করা যায় তবে বালির ভাগ বেশী এমন দোঁয়াশ মাটি আনারসের চাষের পক্ষে অনুকূল। যে সব জায়গার তাপমাত্রা 60° থেকে 90° ডিগ্রি ফারেনহাইটের মধ্যে সে সব জায়গা আনারস চাষের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। ভারতের পশ্চিম উপকূলের ফসল ক্যানি শ্রেণীর জন্য এই তাপমাত্রা বেশ অনুকূল। গাছের বিভিন্ন অংশ মাটিতে বুনে গাছের চাষ করা হয়। জুলাই ও আগষ্ট মাসে এই অংশগুলি মাঠে লাগিয়ে দেওয়া হয়। দুটো সারি করে সোয়া মিটার পর পর অংশগুলি লাগান হয়। আবার দুটো সারির মধ্যে ব্যবধান রাখা হয় 0·7 থেকে 0·9 মিটারের। জমির আগাছা পরিষ্কার করা, নিয়মিত ভাবে পাতাগুলি

ছেঁটে দেওয়া চাষের অঙ্গ। চাষের জমিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট, পটাসিয়াম সালফেট ও সুপার ফসফেট 1:2:3 অনুপাতে মিশিয়ে ব্যবহার করা হয়। এক একর জমিতে এই সারের প্রয়োজন প্রায় 300 কেজি। ফলের রং যখন ফিকে সবুজ বা গোড়ার দিকটা একটু হলদে হলদে হয় তখনই ফসল তোলার উপযুক্ত সময়। একটু কম পাকা ফল স্বাদ ও গন্ধে একটু নীচু মানের হয় বলে বাজারে কম দামে বিক্রি হয়। বিভিন্ন জায়গায় ফলনের পরিমাণ বিভিন্ন হয়। হাওয়াই দ্বীপে এক হেক্টর জমিতে প্রায় 100 মেট্রিক টন ফসল উৎপন্ন হয়। কিন্তু অন্যান্য জায়গায় এই ফলনের পরিমাণ 15 থেকে 25 মেট্রিক টন।

বিভিন্ন রকমের কীট-পতঙ্গ অনারসের চাষের ক্ষতি করে। তবে ভারতের আনারসে কীট-পতঙ্গের আক্রমণ বড় বেশী একটা হয় না। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ছত্রাকের আক্রমণে ফসলের ক্ষতির কথা জানা আছে।

ফল হিসাবে আনারসের সমাদর অনন্য। বেশীর ভাগ আনারস টিনে ভর্তি করে চালানের জন্য বিক্রি হয়। ভারতে এই শিল্পের প্রসার কম বলে বেশির ভাগ আনারস খোলা বাজারে ফল হিসাবে বিক্রি হয়। জেলি ও জ্যাম হিসাবে ভারতের বাজারে টিনে বা কৌটায় ভর্তি করে বিভিন্ন বাজারে আনারসের বিক্রি চালু আছে। টিনে ভর্তি করে আনারসের ব্যবসায়তে অমসৃণ চোখগুলি ও আঁশযুক্ত খোসাগুলি বেশ অসুবিধার সৃষ্টি করে।

এই শিল্পের উপজাত টুকরাগুলি গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। হাওয়াই অঞ্চলের আনারস বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে যে এতে সাধারণতঃ শতকরা 65·7% ভাগ খাবার উপযুক্ত রস। এই ফলের 4·6% শর্করা জাতীয় পদার্থ, 85·5% ফলের জল,

প্রোটিন 0·6%, অজৈব পদার্থ 0·5%, ক্যালসিয়াম 0·02%, ফসফরাস 0·01%, আয়রণ 9 মিলিগ্রাম, ভিটামিন সি 63 মিলিগ্রাম ও ভিটামিন এ 63 ইউনিট।

আনারসের পাতা থেকে মসৃণ ও সুন্দর আঁশ তৈরী হয়। এক মেট্রিক টন আনারসের পাতা থেকে 25 থেকে 30 কেজি পরিমাণ সুতা পাওয়া যায়। আনারসের সুতা শিল্কের মত চকচকে, শক্ত এবং জলে নষ্ট হয় না। এই আঁশ তৈরী যথেষ্ট খরচ সাপেক্ষ। পাতার সবুজ অংশগুলি ছাড়িয়ে আঁশগুলি জলে ভিজিয়ে দেওয়া হয়। এরপর আলাদা করা আঁশ রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এই রকম পদ্ধতি কয়েকবার পুনরাবৃত্তি করে সুতা বেশ চকচকে করা হয়। এই সুতা থেকে তৈরী রুমাল শিল্কের রুমালের মত দেখতে হয়। ফিলিপাইন অঞ্চলে এই সুতা দিয়ে সুন্দর ও মূল্যবান কাপড় তৈরী হয়। সুতা তৈরীর উপজাত খোসা বা টুকরা অংশ থেকে কাগজ তৈরীর উপাদান পাওয়া যায়।

কাঁচা অনারস ভাল জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অন্তসত্বা রমণীদের আনারস গ্রহণে গর্ভপাত পর্যন্ত হতে পারে। কেউ কেউ মনে করেন পাকা ফলের রসের প্রভাবে জরায়ুর সঙ্কোচন ঘটে। এই প্রভাবের পিছনে বিশিষ্ট এক ধরণের ষ্টেরয়েড কাজ করে। অনেক সময় পাকা ফলের রস অপরাধাত্মক কাজে ব্যবহৃত হয়। ফলের রস বা পাকা ফল স্কার্ভি রোগের বিরুদ্ধে ফলপ্রদ। টাটকা ফলে ব্রোমোলিন নামক এনজাইম আছে যা পরিপাক ক্রিয়ার বিশেষ সহায়ক। পাকা ফলের রস মূত্রবৃদ্ধিকারক। আনারসের পাতার রস পেটের নানা রকম উপসর্গ এবং ক্রিমি রোগের পক্ষে উপকারী।

ওলট কম্বল

গত শতাব্দির ভারতের বিশিষ্ট উদ্ভিদ বিজ্ঞানী ওলট কম্বল গাছের আঁশ দেখে খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। আঁশগুলো ছাড়ান খুবই সহজ আর চক্‌চকে। সে জন্য বক্কবার্গ ভেবেছিলেন এই আঁশ, শন বা পাট জাতীয় সুতার বিকল্প হিসাবে বাণিজ্যিক সম্পদ হিসাবে প্রসার লাভ করবে। কিন্তু পাট আর শন জাতীয় সুতার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ওলট কম্বলের সুতা দাঁড়াতে পারেনি। এক হেক্টর জমিতে পাট বা শন জাতীয় সুতা যতটা উৎপন্ন হয় সে তুলনায় ওলট কম্বল পাওয়া যায় তার প্রায় পাঁচ শতাংশ। এ ছাড়া অন্যান্য পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এবং বয়ন শিল্পের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বক্কবার্গের আশা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। ওলট কম্বলের আসল কদর হচ্ছে বনৌষধি হিসাবে এই গাছের ব্যবহারের জন্য। পুরাকাল থেকে মেয়েদের যৌনচক্রের স্বাভাবিক গতিবিধির ব্যতিক্রমে এই বনৌষধি সফলতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ভারতের বিভিন্ন অংশের অনেক চিকিৎসকই এই বনৌষধি বাধক রোগে বা রজো-নিয়ন্ত্রণের ওষুধ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। অধিক প্রস্রাবের পরিমাণ, মূত্রত্যাগের পর পিপাসা, শর্করার আধিক্য, রাত্রে পুনঃ পুনঃ মূত্রত্যাগ ও অনিয়মিত হৃদস্পন্দন প্রভৃতি উপসর্গে ওলট কম্বলের ব্যবহারের উল্লেখ আছে।

বাংলা, হিন্দি ও কচ্ছ ভাষায় ওলট কম্বল একই নামে পরিচিত। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এই গাছ অ্যাব্রোমা অগষ্টা লিন্ (Abroma augusta Linn.) নামে পরিচিত। অ্যাব্রোমা কথাটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে। এর অর্থ হচ্ছে খাদ্য হিসাবে অনুপযুক্ত। ছোট ছোট ঝোপ হিসাবে গাছগুলি জন্মায়। অনেক জায়গায় এই গাছের চাষ হয় যেমন

সিকিম, উত্তর প্রদেশ ও আসামের কোনও কোনও অংশে। গাছগুলি লম্বা হয় এবং ফিকে হলদে রং এর বাকল আঁশযুক্ত। ছোট ছোট ফুলগুলির লাল পাপড়ি থাকে। বর্ষাকালে ফুল ফোটে আর বীজ পাকে শীতকালে।

বনৌষধি হিসাবে ওলট কম্বলের ব্যবহারের কথা যেমন পুরাণ চিকিৎসা শাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে জানা যায় তেমনি গেল শতকে এবং বর্তমান শতকের প্রথম দিকে বেশ কয়েকজন চিকিৎসক এই গাছের ব্যবহারের কথা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পত্রিকা বা গ্রন্থে প্রকাশ করেছেন। গেল শতকে (1872) ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল গেজেটের এক পত্রিকায় ডাঃ ভুবনমোহন সরকার ওলট কম্বলের ব্যবহার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন। তাঁর ধারণা ছিল সম্ভবতঃ শিকড়ের ছাল থেকে এক রকমের কষ বের হয় এবং তার উপর নির্ভর করে ওলট কম্বলের রজো নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা। ডাঃ ম্যাকলিয়ড পুরাণ অনেক বিশারদের মতামত উল্লেখ করে মতামত প্রকাশ করেছেন যে শোণিত সঞ্চয়প্রবণ বাধকে ওলট কম্বল বিশেষ কার্যকরী। এই শতকের প্রথমে ডাঃ কার্তিক বসু মতামত প্রকাশ করেছেন যে ওলট কম্বলের শিকড়ের গুণাগুণ নষ্ট হয়ে যায় সুরাসার কিংবা অনুরূপ জৈব দ্রাবকের প্রভাবে। সে জন্য তাঁর মত অনুসারে সদ্য সদ্য সংগৃহীত শিকড় কিংবা শিকড়ের ছাল ব্যবহার করা শ্রেয়।

রাসায়নিক পরীক্ষা করে ডাঃ চোপড়া দেখেছেন যে ওলট কম্বলের ছালে খানিকটা উপক্ষার থাকে। এছাড়া ছালের জলীয় দ্রবণে খানিকটা ক্ষার পদার্থ এবং কিছু পরিমাণ ম্যাগনেসিয়াম লবণ থাকে। তাঁর অভিমত অনুসারে ম্যাগনেসিয়াম লবণের উপর নির্ভর করে গর্ভাশয়ের রক্তস্রাব জনিত রোগে ওলট কম্বলের কার্যকরিতা। ওলট কম্বলের ছাল নানা ধরণের স্ত্রীরোগে অন্যান্য ওষুধের সংমিশ্রণে ব্যবহৃত হয়।

কাজু-বাদাম

পর্তুগীজগণ 1510 সালে ভারতে তাদের ঘাঁটি স্থাপন করার পর ভারতে অনেকগুলি উদ্ভিদের প্রবর্তন করে। এদের মধ্যে বেশ কয়েকটা আজকের ভারতীয় তরু সম্পদের অন্যতম। কাজু-বাদামের গাছ সেই উদ্ভিদ গোষ্ঠীর অন্যতম একটি। কাজু-বাদাম গাছের আদি বসতি ব্রাজিলে, পেরু ও মেক্সিকো অঞ্চলে। ব্রাজিল থেকে পর্তুগীজগণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে গাছটি প্রচলন করে। এই অঞ্চলে গাছটি 'অ্যাকাজু' নামে প্রথম পরিচিতি লাভ করে কারণ পর্তুগীজগণ গাছটাকে অ্যাকাজু (Acaju) বলত। তখন থেকেই সারাভারতে গাছটা 'কাজু' নামে পরিচিত হয়। ফরাসীগণ নামটা ক্যাসু বলে উচ্চারণ করত সেই থেকে এর ইংরাজী নাম ক্যাসু হয়েছে (Cashew)। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে কাজু-বাদামের গাছ অ্যানাকারডিয়াম অক্সিডেণ্টাল লিন্ নামে পরিচিত (Anacardium occidentale Linn.) ও অ্যানাকারডিসি (Anacardiceae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

কাজু বাদামের গাছ প্রায় 12 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। সব ঋতুতেই গাছে পাতা থাকে। ছাল বেশ অমসৃণ এবং ফলগুলি অদ্ভুত ধরণের। গোটা ফলটার দুটো অংশ। উপরের অংশকে কাজু ফল বলা হয়। এই অংশটি মাংসাল ও বড় রকমের। নীচে থাকে বৃক্কাকার (Kidney shaped) অংশ। এই অংশে একটা খোলার আবরণের ভিতর থাকে কাজু বাদাম। কাজু ফল সাধরণতঃ 5·8 থেকে 7·75 সেমিঃ লম্বা হয়। ফলটার উপরে থাকে মসৃণ চকচকে হলদে খোসা। কাজু-বাদামের শাঁস অর্থাৎ বাজারে যা কাজু বাদাম হিসাবে বিক্রি হয় তা সাদা ধরণের শক্ত ও মসৃণ।

কাজু গাছ ব্রাজিল, পেরু, মেক্সিকো, ভারত ছাড়া মাদাগাস্কার, মোজাম্বিক, সিংহল এবং ফিলিপাইন অঞ্চলে বেশ জন্মায়। ভারতে বোম্বাইয়ের উত্তর ও দক্ষিণ কানাড়া অঞ্চলে, তামিলনাড়ুর মালাবার জেলায় এবং কেরলা অঞ্চলে এই গাছের ভাল চাষ হয়। এছাড়া উড়িষ্যার বালেশ্বর, গঞ্জাম ও মহীশূরে এর কিছু কিছু চাষ হয়। পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার হিজিলি অঞ্চলে কাজু-বাদামের খানিকটা চাষ হয় বলে এই বাদাম হিজিলি বাদাম বলেও পরিচিত।

কাজু-বাদামের গাছ সধারণতঃ শক্ত ও শুষ্ক আবহাওয়া সহনশীল কিন্তু গাছগুলি হিমকাতর। বিভিন্ন রকমের আবহাওয়ায় ও মাটিতে এই গাছ জন্মায়। ভারতের পশ্চিম উপকূলে যেখানে 300 থেকে 380 সেমিঃ বৃষ্টি হয় আবার পূর্ব উপকূলে যেখানে 85 সেমিঃ বৃষ্টি হয় সব জায়গাতেই কাজু-বাদামের গাছ ভালভাবে জন্মায়। একটু বালি মেশান জমিতে গাছগুলি জন্মে কিন্তু শুষ্ক পাহাড়ী অঞ্চলে যেখানে পাথুরে মাটি সেখানেও এই গাছ জন্মে। সাধারণতঃ বীজ বুনে গাছ তৈরী করা হয়। কিন্তু কলম লাগিয়েও গাছের চাষ করা যায়। আমাদের দেশে এই গাছের চাষের জন্য যত্ন কম নেওয়া হয়। দক্ষিণ কানাড়া ও সিংহল অঞ্চলে সাধারণতঃ কৃষকেরা মাটি খুঁড়ে কয়েকটা বীজ বুনে দেয়। পরে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে কয়েক পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর চারাগুলি জন্মায়। তখন ভাল চারাগুলি সংগ্রহ করে ঝুড়িতে মাটির মধ্যে চারাগুলি বাড়তে দেওয়া হয়। একমাস পরে চারাগুলি বড় হলে ঝুড়ি সমেত সমস্ত চারাগুলি 9 মিটার থেকে 12 মিটার পর পর রোপণ করা হয়। সাধারণতঃ এক হেক্টর জমিতে 250টি চারা রোপণ করা যায়। অঞ্চল অনুসারে 125 থেকে 500টা চারা রোপণ করতে দেখা যায়। গাছগুলির ফুল ডিসেম্বরে ফুটতে আরম্ভ করে। প্রায় তিনমাস ধরে ফুল ফুটতে থাকে। তিন বা চার বছর বয়স

থেকে গাছগুলি ফল দিতে আরম্ভ করে। দশ বছর বয়সে ফলন সবচেয়ে বেশী হয়। এর পর আরও বিশ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। ফলগুলি পাকতে দু'-তিন মাস লাগে। খুব বেশী পাকবার আগেই ফলগুলি সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহের সময় ফেব্রুয়ারী থেকে জুনের প্রথম দিকে। একটি গাছ থেকে 50 কেজি পর্যন্ত বাদাম সংগ্রহ করা যায়। সাধারণতঃ পশ্চিম উপকূলে প্রতিগাছে 15 কেজি এবং উড়িষ্যা অঞ্চলে 20 কেজি পর্যন্ত বাদাম সংগৃহীত হয়ে থাকে।

কাজু-বাদামের কদর প্রধানতঃ এর শাঁস ও খোলার জন্য। তামিলনাড়ু ও অন্ধ্র রাজ্যে কোনও কোনও জায়গায় বাদামগুলি সূর্যের তাপে শুকিয়ে খোলা ছাড়িয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু এই পদ্ধতিতে খুব কম পরিমাণ বাদামের খোসাই ছাড়ান হয় (প্রায় 5%)। আঁশগুলির বাজারদর নির্ভর করে এর সুগন্ধ ও স্বাদের উপর। ভাজা বাদামের গন্ধ ও স্বাদ উঁচু দরের। এছাড়া খোলার তেলের বাণিজ্যিক মূল্য বেশী হওয়াতে তাও মূল্যবান সম্পদ। সেজন্য ঠিকমত ভাজা না হলে বাদামের বাজার দাম অনেক কম বেশী হয়ে যায়। সাধারণতঃ জালের ট্রে করে খোলাসমেত বাদাম গরম খোলার তেলের মধ্য প্রবেশ করান হয়। তাপের প্রভাবে খোলার কোষগুলি ভেঙ্গে তেল বেরিয়ে তেলের ভিতর সংগৃহীত হয় এবং বাদামগুলি ভাজা হয়ে যায়। ভাজা বাদাম তারপর ভেঙ্গে শাঁসগুলি সংগ্রহ করা হয়। ভাঙ্গবার সময় যত্ন নেওয়া হয় যাতে সবচেয়ে কম পরিমাণ ভাঙ্গে কারণ বেশী ভাঙ্গা অংশ বেরিয়ে এলে বাণিজ্যিক ক্ষতি বেশী হতে পারে।

কাজুফল কাজুয়্যাল নামে পরিচিত। পাকলে এই ফল খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। একটি গাছ থেকে বছরে প্রায় 37·5 কেজি ফল পাওয়া যায়। ভারতে বছরে প্রায় 1·8 লক্ষ মেট্রিক টন ফল

উৎপন্ন হয়। ফলের রস থেকে সুরাসার প্রস্তুত করা যায় তবে এর বাণিজ্যিক ব্যবহার নেই বললেই চলে। তামিলনাড়ুর শিল্পবিভাগ কাজুফল থেকে সোনালী হলদে রঙের গন্ধবিহীন একরকম সিরাপ তৈরীর পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। পাঁচ-ছয়টা ফল থেকে এক আউন্স সিরাপ তৈরী হয়। এছাড়া ফল থেকে ভিনিগার তৈরী হয়।

কাজু-বাদামের শাঁসের রাসায়নিক পরীক্ষাতে দেখা গিয়েছে যে এতে প্রোটিন 21·1%, জল 5·9%, তৈল জাতীয় পদার্থ 46·9% শর্করা জাতীয় পদার্থ 22·3%, অজৈব পদার্থ 2·4%, ক্যালসিয়াম 0·05%, ফসফরাস 0·45% এবং লৌহ 5 মিলিগ্রাম।

1932 সালের পর খোলার তেল ধীরে ধীরে অনন্য বাণিজ্য সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কাজু-বাদাম ভাজার সময় যে খোলার তেল পাওয়া যায় সেটাই কাজু-বাদামের খোলার তেল হিসাবে বাজারে বিক্রি হয়। খোলা থেকে এর নিষ্কাষিত তেল থেকে এই তেল খানিকটা আলাদা ধরনের। খোলার তেলের দুটো প্রধান উপাদান অ্যানাকারডল ও অ্যানাকারডিক অ্যাসিড (Anacardol and anacardic acid)। অ্যানাকারডিক অ্যাসিডের অনেকগুলি অণু সংঘবদ্ধ হয়ে বৃহৎ অনু সৃষ্টি করতে পারে বলেই খোলার তেলের বহুবিধ ব্যবহার সম্ভব হয়েছে। অ্যানাকারডিক অ্যাসিড উদ্ভূত যৌগের সঙ্গে ফরম্যালডিহাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়াতে রাবারের মত বা অনুরূপ শক্ত ও তাপ সহনশীল রজন বা প্লাষ্টিক জাতীয় পদার্থ তৈরী করা যায়। এই প্লাষ্টিক বেশ টেকসই কারণ অনেক রাসায়নিক যৌগের সঙ্গে ইহা বিক্রিয়া করে না। এই তেল বিভিন্ন রকমের বাণিজ্যিক সামগ্রীর উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই সব জিনিষের মধ্যে আছে বিভিন্ন ধরনের বা।নস, বিভিন্ন ধরনের সিমেণ্ট, টাইপরাইটার রোল, বিভিন্ন ধরনের আঠা জাতীয় জিনিষের। এছাড়া মাছ ধরার জাল, ওয়াটার প্রুফ স্তর ও নৌকার রং-এর উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অ্যানাকারডিক অ্যাসিড জীবাণুবৃদ্ধি রোধ করতে পারে। মশার লার্ভার ধ্বংসের ব্যাপারে কেরসিনের সঙ্গে শতকরা পাঁচ ভাগ মিশিয়ে খোলার তেল বিশেষ কার্যকরী।

কাজু ফলের রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে এতে জল 33 9%, প্রোটিন 2%, শর্করা জাতীয় উপাদান 11%, তৈল জাতীয় উপাদান 0·7%, অজৈব উপাদান 0·2%, আয়রন 0·2 মিলিগ্রাম %. এছাড়া ভিটামিন সি 261·4 মিলিগ্রাম % এবং কেরটিন 0·09% আছে।

ভারতে উৎপন্ন শাঁসের শতকরা পঁচিশ ভাগ দেশে ব্যবহৃত হয়। অবশিষ্ট 75% বিদেশে রপ্তানী হয়। রপ্তানী মালের বেশীর ভাগ (80%) যায় আমেরিকাতে, বাকী অংশের বেশীর ভাগ চালান হয় ক্যানাডা, ইংলণ্ড, অষ্ট্রেলিয়াতে। রপ্তানীর বাদামে খোসা থাকে না। বাদামগুলি বাছাই করে লবণ দিয়ে খাবার উপযুক্ত করে কার্বন-ডাই অক্সাইড পূর্ণ টিনে ভরে বিদেশে চালান দেওয়া হয়। যদিও ব্রাজিলে ও পূর্ব আফ্রিকাতে যথেষ্ট পরিমাণ কাজু-বাদাম উৎপন্ন হয় একমাত্র ভারত থেকেই খাবার উপযুক্ত করে কাজু-বাদাম বিদেশে রপ্তানী হয়। কাজু-বাদামের রপ্তানী 1925 সাল নাগাদ আরম্ভ হয়েছে। বর্তমানে উদ্ভিজ্জ সামগ্রীর মধ্যে চায়ের পরেই কাজু-বাদাম বিদেশ থেকে সবচেয়ে বেশী ডলার আয় করে। খোলার তেলের গুরুত্ব বাড়াতে তেল ও তেল থেকে তৈরী জিনিষগুলি অনন্য বাণিজ্য সম্পদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। শাঁসের খোসা ও ভাঙ্গা অংশ গবাদি পশুর ভাল খাবার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। গাছ থেকে যে হলদে আঠা জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায় তার পোকামাকড় ধ্বংস করার ক্ষমতা আছে এবং বই বাঁধাইয়ের কাজে ব্যবহৃত হয়। এর কাঠ লালচে রঙ্গের ও বেশ শক্ত। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে ছোট ছোট প্যাকিং বাক্স ও নৌকা তৈরীর জন্য এই কাঠ ব্যবহৃত হয়।

কুঁচ

কুঁচের লাল বীজ রতি বলে পরিচিত। অনেক দিন থেকেই ভারতীয় স্বর্ণকারগণ রতি দিয়ে সোনা ওজন করেন। কথিত আছে শাজাহানের কহিনুরও প্রথমবার ওজন করার সময় রতি ব্যবহার করা হয়েছিল। হয়ত কুঁচের বীজ পেকে একটা সঠিক ওজনে আসে বলে রতি মূল্যবান ধাতুর ওজনে বহুল প্রচলিত। শুধুমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, জাভা ও মালয়দেশেও রতির এই রকম ব্যবহার প্রচলিত। সোনার মত মূল্যবান ধাতুর ওজন করার জন্য কুঁচের বীজের এই ধরনের ব্যবহারের পিছনে বিজ্ঞানসম্মত যুক্তি প্রশ্নাতীত নয়। অনেকে মনে করেন রতি থেকে আরবী কথা কিরাত এসেছে। কিরাত থেকে এসেছে ক্যারেট কথাটি। এক ক্যারেটের ওজন এক আউন্সের $\frac{1}{24}$ ভাগ। সাধারণতঃ ভারতীয় মান অনুযায়ী এক রতির ওজন 1·75 গ্রেন। এই হিসাবে ক্যারেট দাঁড়ায় রতির সমানে। কুঁচের লাল রংএর বীজ কৃষক বধুর অঙ্গের আভরণ হিসাবে শোভা পেতে আগেকার দিনে। সন্ন্যাসীরা ব্যবহার করেন বীজগুলো তাঁদের জপমালায়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে কুঁচ অ্যাব্রাস প্রিকেটেরিয়াস লিন্ (Abrus precatorius Linn.) নামে পরিচিত। অ্যাব্রাস কথাটা এসেছে গ্রীক ভাষা থেকে; এর অর্থ হচ্ছে সুন্দর। হয়ত কুঁচ গাছের সৌন্দর্যের জন্য এর এই রকম নামকরণ। ভারতে প্রায় এক হাজার মিটার উঁচু জায়গা পর্যন্ত কুঁচ গাছ জন্মায়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে কুঁচ বিভিন্ন নামে পরিচিত।

রক্সবার্গ তিন রকমের কুঁচগাছের কথা উল্লেখ করেছেন। তার মধ্যে দুরকমের গাছ সাধারণতঃ চোখে পড়ে। প্রথম রকমের গোলাপী

রঙের ফুল, লাল রঙের বীজ ও তাতে কাল চোখ। দ্বিতীয় রকমের কালরঙের বীজ ও তাতে সাদা চোখ দেখা যায়। যে সব কুঁচের বীজ লাল রঙের হয় সেগুলি রক্তিকা, ককসিঞ্চি, কাকদানী, অঙ্গার-বল্লী প্রভৃতি নামে পরিচিত। কুঁচগাছের লতায়িত পাতা, ফুল বীজের রঙ নিয়ে গাছটি সব সময়ই সুন্দর দেখায়। এর শিকড় বেশ শক্ত এবং এর নানা শাখা প্রশাখা আছে। এর ছাল খুব পাতলা আর লালচে, কাঠ সাদা। শিকড় ভাঙ্গলে এক রকমের অদ্ভুত গন্ধ পাওয়া যায়। শিকড় মুখে দিলে প্রথমে তেতো লাগে পরে মিষ্টি স্বাদ পাওয়া যায়।

কুঁচগাছ ও তার বিভিন্ন অংশ অনেক পুরাকাল থেকেই ভেষজ হিসাবে ব্যবহৃত হয় বলে জানা আছে। সর্দি-কাশিতে শিকড়ের ব্যবহার হয় বিশেষ করে যখন যষ্ঠিমধুর সরবরাহ কম থাকে। গলা ভাঙ্গার উপসর্গে শিকড় চিবিয়ে খাওয়ার রীতি প্রচলিত। কুঁচের বীজের নানা রকমের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। ইউ. সি. দত্ত তাঁর হিন্দু মেটেরিয়া মেডিকাতে কুঁচের বীজ গুঁড়ো করে বিভিন্ন ধরনের স্নায়ুরোগে ব্যবহারের উল্লেখ করেছেন। চর্মরোগ এবং চুলের শ্রীবৃদ্ধিতে এর প্রচলন আছে। চুলের শ্রীবৃদ্ধিতে বীজের গুড়া অন্যান্য কয়েকটি গাছগাছড়া আর রাসায়নিক যৌগের সহযোগে ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আয়ুর্বেদ সংগ্রহে কুঁচের বীজের টাকনাশক গুণ আছে বলে উল্লেখ আছে।

সময়ে খাদ্য হিসাবে বীজ ব্যবহৃত হয়েছে বলে নজীর আছে। খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্য বীজ ফুটন্ত জলে সিদ্ধ করে নিলে বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। জলটা ফেলে দিয়ে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

রাসায়নিক পরীক্ষায় কুঁচের বিভিন্ন অংশ থেকে বিভিন্ন যৌগ পাওয়া গিয়েছে। শিকড় আর পাতায় গ্লিসিরিজিন নামক যৌগ

পাওয়া যায়। এই যৌগের উপর নির্ভর করে কুঁচের পাতার ও শিকড়ের মিষ্টত্ব। এই যৌগ যষ্ঠিমধুতেও থাকে বলে সর্দি, কাশিতে যষ্ঠিমধুর বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং কুঁচ গাছ বন্য যষ্ঠিমধু নামে পরিচিত। এছাড়া কুঁচের বীজ থেকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক যৌগ আলাদা করা হয়েছে। এর মধ্যে অ্যাব্রিন নামক অ্যালবুমেন জাতীয় যৌগ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই যৌগের উপর কুঁচের বিষক্রিয়া নির্ভর করে। আধুনা এই বিষ জনিত প্রোটিনের নানা রকম গবেষণা বসু বিজ্ঞান মন্দিরে এবং বিদেশে অনেক জায়গায় বিশদভাবে করা হয়েছে। এর মধ্যে গ্লোবিউলিন আর অ্যালবুমিন জাতীয় প্রোটিন আলাদা করা হয়েছে। দুটিরই বিষক্রিয়া আছে। 100° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় অ্যালবুমিনের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। সেজন্য সিদ্ধ করে জোলাপ ও খাদ্য হিসাবে কুঁচের বীজের ব্যবহারের খানিকটা বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চলে। বীজ থেকে অ্যাব্রাইন নামক একটি উপক্ষার আলাদা করেন ডাঃ ঘটক প্রমুখ রসায়নীগণ। এই যৌগ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রসায়নীগণ সংশ্লেষণ করে এর গঠন বিন্যাস ঠিক করেছেন। এছাড়া গ্লুকোজ সংলগ্ন যৌগ অ্যাব্রালিন আলাদা করা হয়েছে। বীজ থেকে বীজের তেল, খোসার রঞ্জন দ্রব্য এবং গ্লুকোজ সংলগ্ন অ্যানথোসায়ানিন আলাদা করা হয়েছে।

জোলাপ হিসাবে কুঁচের বীজ ব্যবহারের কথা পুরান পুঁথিপত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু কুঁচের বীজের বিষক্রিয়া এই ব্যবহারের পরিপন্থী। কুষ্ঠ রোগের বিরুদ্ধেও কুঁচের বীজের ব্যবহারের কথা জানা আছে। কুঁচের বীজের বিষক্রিয়ার সুযোগ নিয়ে অনেক সময় অবৈধভাবে চারণ ক্ষেত্র থেকে গরুর বা ভেড়ার চামড়া দুর্বৃত্তগণ সংগ্রহ করত। তীরের ডগায় কুঁচের বীজের গুঁড়া শক্ত করে লাগিয়ে ছুড়ে তারা গরুর দেহে প্রবেশ করিয়ে দিত। রক্তের সংস্পর্শে আসার সঙ্গে সঙ্গে তীরের তথা কুঁচের বীজের

বিষক্রিয়া আরম্ভ হয়। তীরের বিষের প্রভাবে রক্ত জমাট বাধতে শুরু করে এবং পরে পশুর মৃত্যু ঘটে। কুঁচের বীজের প্রভাবে নারীদেহের গর্ভপাত হতে পারে। সে কারণে কুঁচের বীজ অপরাধাত্মক কাজে ব্যবহারের অনেক নজীর পাওয়া যায়। নারীদেহের গর্ভপাতের জন্য কুঁচের বীজের ব্যবহার বর্জনীয় কারণ এর বিষক্রিয়াতে রোগী মারা যেতে পারে। নরহত্যার জন্যও কুঁচের বীজের ব্যবহারের অনেক নজীর আছে। দেহের যে জায়গায় কুঁচের বীজ প্রবেশ করান হয় সে জায়গা প্রথমে ফুলে ওঠে। এর পর আরম্ভ হয় ব্যথা ও পরে সমস্ত দেহ জড়ে প্রদাহ আরম্ভ হয়। তিন থেকে চার দিনের মধ্যে মৃত্যু ঘটতে পারে। এই সকল কারণে অপরাধ বিজ্ঞানের তরফ থেকে কুঁচ বিশেষ গুরুত্বসম্পন্ন। খোসা ছাড়িয়ে কুঁচের বীজের রস বিশেষ রকম চোখ ওঠার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হত। কিন্তু এই রকম ব্যবহারেও অনেক সময় রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে দেখা গিয়েছে। মিশরের কোনও কোনও অংশে কুঁচের বীজ সিদ্ধ করে খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। ভারতবর্ষেও কুঁচের বীজ দুর্ভিক্ষের সময় খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। যদি প্রতি গ্রাম দেহের ওজনে 0.0005—0.001 মিলিগ্রাম অ্যাব্রিন ইনজেকশান দেওয়া হয় তবে এই যৌগের বিষক্রিয়া বেশ ভালভাবে বোঝা যায়। গুঁড়ো বীজের জলীয় নিষ্কাশন চোখের পক্ষে বিশেষ অপকারী, এমন কি এর ফলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। অ্যাব্রিনের বিষক্রিয়া মুখপথে কম হয়। রক্তের সংস্পর্শে এলেই বিষক্রিয়া দেখা যায় কারণ এই বিষ রক্তের লাল কণিকাগুলি জমাট বাধিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে। পাকস্থলীর ভিতর পরিপাক ক্রিয়াতে অ্যাব্রিনের বিষক্রিয়া নষ্ট হয়। প্রাণীদেহে অতি অল্প অল্প করে অ্যাব্রিন ইনজেকশান দিয়ে অ্যাব্রিনের বিষক্রিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা যায়।

খয়ের

ভারতের পুরাণ পুঁথি পত্রে খয়ের সম্বন্ধে নানা ধরণের কাহিনী পাওয়া যায়। খয়ের মঙ্গল এবং কার্তিকের তুষ্টি সাধন করতে সক্ষম বলে কথিত হয়। আধুনিক কালের ঘটনার মধ্যে ইংলণ্ডে খয়ের প্রচলনের কাহিনী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খয়েরের ইংরাজী নাম কাচ (Cutch)। সম্ভবতঃ খয়েরের কানাড়ি ভাষার নাম থেকে এই কথাটি প্রচলিত। ইংরাজীতে খয়ের ক্যাটাচু নামেও পরিচিত। ইংলণ্ডে খয়ের রপ্তানী হত দক্ষিণ ভারত থেকে। প্রথম প্রথম খয়ের ইংলণ্ডে যেত জাপান হয়ে। তাই সেখানে খয়ের তখন 'টেরা জ্যাপনিকা' নামে পরিচিত ছিল। 1574 সালের গার্সিয়া-দে-আরতা নামক একজন পর্যটক খয়রের চাষ এবং খয়ের তৈরীর পদ্ধতি বর্ণনা করে একটি প্রবন্ধ তৈরী করেন। সতের শতকের আগে এই বিবরণ ইংলণ্ডে পৌঁছায় না। সে জন্য সে পর্যন্ত ইংলণ্ডবাসী এটি খনিজ পদার্থ বলে জানত। 1684তে ক্লেয়ারের বিবরণীতে গার্সিয়ার নিবন্ধের কথা উল্লেখিত হওয়ার পর 1721 খৃস্টাব্দে লণ্ডন ফারমাকোপিয়াতে খয়ের স্থান পায়। আরও পরে 1864 খৃস্টাব্দে ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়াতে খয়ের স্থান পেল।

ভারতবর্ষে খয়ের তৈরী করা একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের পেশা। উত্তর ভারতে এই সম্প্রদায় খয়েরী নামে পরিচিত। দক্ষিণ ভারতে কোথায়ও কোথায়ও কথাকড়ি নামে পরিচিত। কথাকড়ি নামটা এসেছে খয়েরের আর এক নাম 'কথ্থ' থেকে। দ্রব্যগুণ-বিদ্গণ খয়েরকে খদির পর্যায়ে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন। এটি শীতবীর্য, দন্ত হিতকারক, তিক্ত কষায় বলে বর্ণিত। খয়ের দেহের নানারকম উপসর্গে ফলদায়ক বলে দ্রব্যগুণ-বিদ্গণ মনে করেন।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে খয়ের গাছ 'অ্যাকাসিয়া ক্যাটাচু উইল্ড' (Acacia catechu Willd.) নামে পরিচিত ; ভারতের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। গাছটি প্যাপিলোনেসি গোত্রের মাইমোসি উপগোত্রের অর্ন্তভুক্ত। সাধারণতঃ গাছটি 2·5 মিটার থেকে 3 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। 0·3 মিটার থেকে 1 মিটার পর্যন্ত পরিধি হয়। গাছের ছাল কালচে ধূসর বাদামী রঙের। ছাল 1 থেকে 1.25 সেমি পুরু হয়। খয়ের গাছের গুরুত্ব খয়ের বা কাচ্ তৈরীর জন্য।

সাধারণতঃ দুরকমের খয়ের বাজারে বিক্রি হয়। প্রথম রকমের হচ্ছে কাথ্‌থা বা ফিকে রঙের খয়ের। দ্বিতীয় রকমের খয়ের কাচ্ বা গাঢ় খয়ের। কাথ্‌থা বিভিন্ন আকারে বাজারে বিক্রি হয়। কিছু কিছু বর্গাকৃতিরও পাওয়া যায়। এগুলো ভাঙ্গলেই চকচকে স্ফটিকাকারের টুকরো দেখা যায়। পানের সঙ্গে ব্যবহারের জন্য বা ওষুধ তৈরীর জন্য এই শ্রেণীর খয়েরের দেশীয় বাজারে বেশ চাহিদা। দ্বিতীয় শ্রেণীর কাচ্ বাজারে ছোট ছোট ঘন আকারে বিক্রি হয়। এগুলোর রং তামাটে বা ফিকে হলুদ। বাজারে এর চাহিদা রং করার জন্য কিংবা বিভিন্ন জিনিষ সংরক্ষণ করার কাজের জন্যে। অনেক সময় পুরান খয়ের গাছ থেকে খীরশাল নামক এক রকম সাদা চকচকে দানাদার আকারের জিনিষ পাওয়া যায়। এগুলো ঔষুধ তৈরীতে ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে গলার ক্ষত বা কাশির জন্য।

অনেকদিন থেকেই ক্ষুদ্র শিল্প বা গ্রামীণ শিল্পের অঙ্গহিসাবে খয়ের প্রস্তুত একটি গুরুত্ব সম্পন্ন দেশীয় শিল্প হিসাবে গড়ে উঠেছে।

গ্রামীণ শিল্পে অনেকদিন ধরে ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির নড় চড় হয়েছে খুবই কম। খয়ের তৈরীর জন্য সাধারণতঃ 25 থেকে 30 বছরের পুরাণ গাছের সারিকাঠ সংগ্রহ করে ছোট ছোট বর্গাকারে খণ্ড করে 12 ঘণ্টা ধরে মাটির পাত্রে জলে সিদ্ধ করা হয়। এর পর নিষ্কাশন

গাঢ় করে ছাঁচে ঢেলে দেওয়া হয়। এতে বিভিন্ন আকারের খয়ের পাওয়া যায়। খয়েরের নিষ্কাশনের জন্য লোহার কড়া ব্যবহার করা সমীচীন নয় কারণ এতে খয়ের কাল বা সবুজ রঙের হয়ে যেতে পারে। আজকাল টিন দিয়ে মোড়া তামার কড়া ব্যবহারের প্রচলন হয়েছে। গ্রামীণ শিল্পে ছোট ছোট কাঠের অংশ টিনের মোড়া তামার কড়াতে খোলা চুল্লিতে সিদ্ধ করে গরম অবস্থায় পাতলা কাপড়ে ছেকে নেওয়া হয়। এই রকম ভাবে 4/5 বার কাঠের টুকরোগুলি নিষ্কাশন করে যতটা সম্ভব খয়ের নিষ্কাশন করে নেওয়া হয়। নিষ্কাশনগুলি একত্র করে গাঢ় করা হয়। এই ঘন দ্রবণ থেকে কাচ্ কেলাসিত হয়। আদি দ্রবণ থেকে আবার খানিকটা কাচ্ কেলাসিত হয়। কেলাসগুলি নরম থাকতে থাকতে বিভিন্ন আকারের কাচ্ তৈরী করা হয়।

খয়েরের বেশির ভাগ উৎপাদন আসে গ্রামীণ শিল্পের মাধ্যমে। এ ছাড়া বেশ কয়েকটা কারখানা আছে যেখানে উন্নততর পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে উত্তর প্রদেশের 'উড প্রোডাক্টস' এর কারখানা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। খয়ের কাঠের ছোট ছোট খণ্ড গরমজলে খানিকটা চাপের সাহায্যে নিষ্কাশন করা হয়। শূন্যচাপে নিষ্কাশন ঘন করে হিমায়িত অবস্থায় এক সপ্তাহের মত রাখা হয় তখন আস্তে আস্তে কাথ্ পাওয়া যায়। ইর্জ্জতনগরের 'উড প্রোডাক্টসের' মাল বাজারে সব চেয়ে সেরা বলে বিবেচিত হয়। এ ছাড়া গোয়ালিয়র, উড়িষ্যা মধ্য-প্রদেশ ও গুজরাটে বেশ কয়েকটা কারখানায় অনেকটা মাল উৎপন্ন হয়।

সিল্ক ও কার্পাসের সুতো রাঙাতে খয়ের ব্যবহৃত হয়। বিশেষ রকমের রঙিন ছাপার কাজে এবং কাগজ কিংবা কাগজের মণ্ড রাঙাতে খয়ের বেশ ব্যবহার করা হয়। খয়ের দিয়ে রাঙান জাহাজের পাল সমুদ্রের নোনা জলের বিরুদ্ধে টেকসই।

খয়ের গাছের সারি কাঠের উপাদান হচ্ছে ক্যাটাচিন এবং ক্যাটাচুইক অ্যাসিড। এতে ক্যাটাচিনের পরিমাণ থাকে 4% থেকে 7%। পান খেলে যে লাল রং হয় সেটা খয়েরের ক্যাটাচিনের এবং চুনের ক্যালসিয়ামের যুক্ত বিক্রিয়ার ফলে। যদিও পুরাণ পুঁথিপত্রে দন্ত হিতকারক বলে খয়েরের উল্লেখ আছে বেশীমাত্রায় খয়ের ব্যবহার করলে দাঁত কাল হয়।

খয়ের গাছের কাঠ বেশ শক্ত এবং বেশ ভাল পালিশ নেয়। বিভিন্ন ধরণের কাঠের ঘানির জন্য এই কাঠ ব্যবহৃত হয়। গরুর গাড়ীর চাকার জন্য খয়েরের কাঠ বেশ মজবুত বলে বিবেচিত। খয়ের গাছ লাক্ষা চাষের উপযোগী। সাধারণতঃ জুলাই মাসে এই গাছে লাক্ষা চাষ করা চলে। এই লাক্ষা গুণগত ভাবে পলাশ কিংবা কুলগাছের তৈরী মালের অনুরূপ। তবে লাক্ষার পোষকগাছ হিসাবে খয়ের গাছ বেশী ব্যবহৃত হয় না। ভারতে খয়েরের রপ্তানী ও আমদানী দুইই চলে।

ঘৃতকুমারী

আদান উপসাগরের সকোত্র দ্বীপের রমণীদের নিয়ে পুরাকালে একটি কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে রোষ সৃষ্টি হলে তাঁরা কোনও পুরুষের যকৃৎ পর্যন্ত কেড়ে নিতে পারেন। এই কিংবদন্তী সমস্ত দক্ষিণ ইউরোপ এবং আফ্রিকাতে ছড়িয়ে গিয়েছিল। সকোত্রের নারী সমাজের এই অসামান্য ক্ষমতার পিছনে ছিল সে দেশের ঘৃতকুমারী গাছের বা মশাব্বরের ক্ষমতা। ঘৃতকুমারীর আরবীয় নাম মশাব্বর। আসলে মশাব্বর কথাটা এসেছে ল্যাটিন ভাষা থেকে যার অর্থ হচ্ছে যকৃৎ বা লিভার। মশাব্বর আর সকোত্র শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ একই। আরবীয়দের কাছে মশাব্বর ধৈর্যের প্রতীক হিসাবে সম্মান পেয়ে থাকে। আরব্য-উপন্যাসে উল্লেখিত আছে যে কবরের উপর মশাব্বরের গাছ পুঁতে দেওয়া হত। মশাব্বরের ফুল যখন ফুটবে তখন কবরের ভিতরের দেহ চলে যাবে বেহেশ্‌তে, আল্লার বাগানে। কথিত হয় আলেকজাণ্ডার সকোত্র অভিযান করেছিলেন সে দেশের মশাব্বরের লোভে।

ঘৃতকুমারী ভারতীয় গুল্ম কিনা এ সম্বন্ধে মতের গরমিল আছে। ডাওসকরিডাসের বিবরণীতে পাওয়া যায় যে ভারতবর্ষে নবম শতাব্দীতে প্রচুর পরিমাণ মশাব্বর পাওয়া যেত। ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ঘৃতকুমারী এমন সব নামে পরিচিত যে সেগুলোর অর্থ দাঁড়ায় কুমারী দুর্গা। এই থেকে প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ রসায়নী ডাইমক উল্লেখ করেছেন যে ঘৃতকুমারী ভারতীয় বনৌষধীর সভ্য। হয়ত ভারতে ঘৃতকুমারীর চাষ হত না কিন্তু অর্ধবন্য বা বন্যভাবে জন্মাত।

ভারতীয় ঘৃতকুমারী অ্যালো ভেরা লিন্‌ (Aloe vera Linn.) নামে পরিচিত। গাছটি লিলিয়াসি (Liliaceae) গোত্রের অন্তর্ভুক্ত।

ছোট কাণ্ড সমেত গাছটি 0.6 মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়। পাছগুলি রসাল এবং এর পাতা বেশ পুরু আর ধারগুলিতে কাঁটা থাকে। ভারতবর্ষে কুমারিকা থেকে হিমালয় পর্যন্ত সর্বত্র গাছটি অর্ধবন্য হিসাবে জন্মে। এর দু' তিন রকমের প্রকার ভেদ আছে। অ্যালো ভেরা ভার চাইনেনসিস্ বেকার (Aloe vera *var* chinensis Baker) দাক্ষিণাত্যের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। অ্যালো ভেরা ভার লিটেরিয়ালিস [কায়েনেগি] বেকার [Aloe vera *var* Iittorialis (Koenigii) [Baker], তামিলনাড়ুর উপকূলে পাওয়া যায়। এর পাতাগুলি ছোট ছোট। এই রকম গাছগুলি রামেশ্বর পর্যন্ত দেখা যায়। আর এক রকমের ঘৃতকুমারী ভারতে পাওয়া যায় যা জাফরাবাদের অ্যালো নামে পরিচিত।

ভেষজ হিসাবে ঘৃতকুমারী বা অ্যালোর ব্যবহার হিপোক্রিটাস কিংবা থিওপ্রেটাসের গ্রন্থে পাওয়া যায় না কিন্তু ডাওসকোরিডাস ও প্লিনির গ্রন্থে এর ব্যবহারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। নবম শতাব্দির বিশিষ্ট চিকিৎসক আবুহানিফ মশাব্বরের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। আবুহানিফ গাছটির মোটা পাতা, হলদে ফুল আর বেশ রস আছে বলে বর্ণনা করেছেন। আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় অনেকদিন থেকেই ঘৃতকুমারী ব্যবহার হত যদিও ডাইমক উল্লেখ করেছেন যে আরবীয়গণ মশাব্বরের ভেষজীয় ব্যবহার প্রবর্তন করেছে বলে সংস্কৃত চিকিৎসা পদ্ধতিতে এর বিশেষ প্রচলন হয়নি। ডাইমকের মতটাকে ঠিক বলে ধরা যায় না কারণ অনেকদিন থেকে মশাব্বর ব্যবহৃত হয়ে আসছিল পারার শোধনে। জোলাপ হিসাবে, বিভিন্ন রকম জ্বরের উপসর্গ কমাতে, হাঁপানীতে এবং কুষ্ঠ ব্যাধির বিরুদ্ধে ঘৃতকুমারী ফলপ্রদ বলে বলা হয়েছে।

ঘৃতকুমারীর ফুলের ব্যবহার হয় আমাশায় ও পিত্তাধিক্যে। গতশতাব্দির ভারতীয় চিকিৎসকগণের বিবরণ থেকে ঘৃতকুমারীর

বিভিন্ন রোগে ব্যবহারের কথা জানা যায়। ডাঃ এফ. এইচ থ্রনটন অভিমত প্রকাশ করেছেন যে আয়রন সালফেট সহযোগে ঘৃতকুমারী বিশেষ রকমের স্ত্রী রোগে ফলপ্রদ। এছাড়া ফল পাওয়া যায় মাথা ধরা বা কোষ্ঠকাঠিন্যে। ব্যথা এবং বিভিন্ন ধরণের প্রদাহে ঘৃতকুমারীর ব্যবহারের কথা কলকাতার ডাঃ সোম উল্লেখ করেছেন।

সাধারণতঃ পাতা কেটে আড়াআড়িভাবে রেখে দিলে কিছুক্ষণ পর খানিকটা রস বেরিয়ে আসে পাতা থেকে। এই রস সংগ্রহ করে শুকিয়ে বেশ শক্ত করা হয়। বাজারের মশাব্বর, ঘৃতকুমারী বা বিভিন্ন ফারমাকোপিয়াতে বর্ণিত অ্যালো হচ্ছে এই শুকনো জিনিষ। অ্যালোর গুণাগুণ নির্ভর করে কোথা থেকে ঘৃতকুমারী সংগৃহীত হয়েছে এবং কি পদ্ধতি অনুযায়ী তৈরী হয়েছে। দুরকমের অ্যালো আছে। প্রথম রকমের অ্যালো লিভারি অ্যালো নামে পরিচিত। মশাব্বরের রস রোদে শুকিয়ে অল্প অল্প তাপে তাতিয়ে নিয়ে এই ধরণের অ্যালো তৈরী করা হয়। এগুলো অস্বচ্ছ এবং স্ফটিকাকারের নয়। আর এক ধরণের অ্যালো গ্লসি অ্যালো নামে পরিচিত। মশাব্বরের রস রোদে শুকনো করে একটু বেশী উত্তাপে তাতিয়ে শুকনো করা হয়। এর ফলে অ্যালো স্বচ্ছ ও চকচকে হয়। ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়াতে অবশ্য চার রকমের অ্যালো প্রামাণিক বলে গণ্য হয়। [ক] কারকাও অ্যালো বা বারবাডোসের অ্যালো, এগুলির রং খয়েরী ; [খ] সাকোত্রের অ্যালো, হলদে কিংবা একটু কাল ; [গ] জাঞ্জিবার অ্যালো ; [ঘ] কেপ অ্যালো গাঢ় খয়েরী রং এর। প্রথম তিন প্রকারের অ্যালো লিভার পর্যায়ের চতুর্থটি গ্লাসি পর্যায়ের।

খয়ের, লোহার ডেলা পাথরের কুঁচি প্রভৃতি বাণিজ্যিক অ্যালোর সঙ্গে ভেজাল দেওয়া হয়। এগুলো সহজেই ধরা যায়। সুরাসারে নিষ্কাশনে পাথরের কুঁচি বা লোহার ডেলা আলাদা হয়ে যায়। ভেজাল অ্যালোর সুরাসার নিষ্কাশন অতিবেগুনী অ্যালোতে কালো দেখা যায় আর বিশুদ্ধ অ্যালোর সুরাসার নিষ্কাশন পিঙ্গল রং এর।

অ্যালোর রাসায়নিক পরীক্ষা করে অ্যালোয়ান নামক কতগুলি গ্লুকোজ সংলগ্ন যৌগ পাওয়া যায়। বারব্যালোয়ান, অ্যালো এমডিন ছাড়া অ্যালো থেকে খানিকটা রজন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। মশাব্বরের গন্ধ তার গন্ধ-তেলের জন্য। চোপরা ও ঘোষ অ্যালো ভেরা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে এতে অ্যালোয়ান নেই আছে খানিকটা রজন জাতীয় আর আঠা জাতীয় জিনিস। এছাড়া খানিকটা অ্যানথ্রাকুইনোন গোষ্ঠীর যৌগ এমডিন। জাফরাবাদ অ্যালোতে 13·6% অ্যালোয়ান থাকে।

ভারতীয় ফারমাকোপিয়াতে (1955) জোলাপ হিসাবে অ্যালোর ব্যবহারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। দু থেকে তিন গ্রেন অ্যালো 8 থেকে 12 ঘণ্টার মধ্যে কার্যকরী হয়। অ্যালোর প্রভাবে তলপেটে কতগুলি উপসর্গ দেখা যায় বলে জোলাপ হিসাবে এর ব্যবহারে সাবধান হতে হয়। যাদের অন্ত্রপ্রদাহ আছে তাদের পক্ষে জোলাপ হিসাবে অ্যালো গ্রহণ করা উচিত নয়। অন্তঃসত্ত্বা রমণীদের পক্ষে অ্যালো গ্রহণ করা ক্ষতিকর।

অ্যালোর কারবার ভারতবর্ষ, উত্তর আফ্রিকা, আরব ও দক্ষিণ ইউরোপে চলত অনেকদিন থেকেই। বর্তমান শতাব্দির প্রথম দিকে অ্যালোর আমদানী ও রপ্তানীর কারবার চলত। আজকাল রপ্তানী বন্ধ হয়ে গেছে আর আমদানীর কারবারও মন্থর হয়ে নিশ্চল হয়ে এসেছে।

চীনাবাদাম

চীনাবাদামের আদি বসতি ব্রাজিলে। ব্রাজিল থেকে চীনাবাদাম আমদানীর আগে সারা পূর্ব গোলার্ধে চীনাবাদাম জানা ছিল না। ভারতে চীনাবাদাম আসে ষোল শতকে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চীনাবাদাম অনুপ্রবেশ করেছে হয়ত বিভিন্ন দেশের মধ্য দিয়ে। এর জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চীনাবাদাম বিভিন্ন নামে পরিচিত। অবিভক্ত বাংলাদেশে চীনাবাদাম হয়ত চীনদেশ থেকে এসেছিল তাই এই অঞ্চলে এর নাম চীনাবাদাম। দক্ষিণ ভারতে হয়ত চীনাবাদাম এসেছিল ম্যানিলা থেকে তাই দক্ষিণ ভারতে চীনাবাদাম ম্যানিলাকোটাই নামে পরিচিত। ভারতের চীনাবাদাম সম্বন্ধে প্রথম বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় বুকানন হ্যামিলটনের বিবরণ থেকে। ষোল শতকে ভারতে চীনাবাদামের চাষ আরম্ভ হয়। আজকে চীনাবাদাম আমাদের অনন্য তৈলবীজ সম্পদ।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে চীনাবাদাম অ্যারাকিস হাইপোজিয়া লিন্ (Arachis hypogea Linn.) নামে পরিচিত। গাছটি প্যাপিলোনেসি গোত্রের অর্ন্তভুক্ত। চীনা বাদামের গাছ ছোট ছোট গুল্মজাতীয় 0·3 থেকে 0·6 মিটার লম্বা হয় এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মাটির উপর ছড়িয়ে থাকে। এর ছোট ছোট হলুদ ফুল হয় এবং ফলগুলি মাটির নীচে হয়। ফল পাকতে প্রায় দু'মাস লাগে। একটা খোলার মধ্যে দুটি বীজ থাকে এবং এই বীজগুলিই চীনাবাদাম নামে পরিচিত। তেল ও প্রোটিন সমৃদ্ধ ফিকে হলদে রং এর বীজের উপর একটা লালচে খোসা থাকে।

চীনাবাদামের গুল্ম সাধারণতঃ দুরকমের প্রথম ধরণের হচ্ছে লতান (runner type) অপরটি গুচ্ছ ধরণের (bunch type)।

গুচ্ছ ধরণের গুল্মগুলি কম জায়গা নিয়ে জন্মায়। 3 থেকে 4 মাসের মধ্যে এগুলোর ফলন হয়। এই ধরণের চীনাবাদামের গাছের শাখা-গুলি সোজা হয় এবং ফলগুলি শিকরের সঙ্গে লেগে থাকে। ফলগুলি ছোট আকারের আর খোলাগুলি পাতলা হয়। 'লতান' ধরণের গাছগুলি অনেকটা জায়গা জুড়ে হয় এবং ফসলগুলি একটু বেশী জায়গা জুড়ে ফলে। এ ধরণের গুল্মের চারা থেকে ফল হওয়া পর্যন্ত সময় লাগে ছ'মাস।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকারের চীনা বাদামের চাষ হয়। ভারতে সাধারণতঃ চার রকমের দানা পাওয়া যায়। এর মধ্যে 'করমণ্ডল' এবং বোল্ড জাতের দানা লতান ধরণের গাছ থেকে পাওয়া যায়। পীনাট ও 'রেড নেটাল' জাতের দানা পাওয়া যায় গুচ্ছ ধরণের গাছ থেকে। এছাড়া বোম্বাইতে আরও দুরকমের চীনা বাদাম পাওয়া যায়। সেগুলো হচ্ছে করাদ ও ভার্জিনিয়া জাতের। বোল্ড জাতের চীনা বাদামগুলো বেশ বড়। এর 5টা শাঁসের ওজন প্রায় এক আউন্স হয়। করমণ্ডল জাতের দানা বোল্ড জাতের দানা থেকে একটু ছোট হয়। পীনাটগুলি ছোট ও গোল আকারের হয়ে থাকে। এগুলোর কম পক্ষে 77টি মিলে এক আউন্সের মত ওজন হয়। রেড নেটাল জাতের ফলের খোসার রং গাঢ় লাল হয় আর এর তেল হয় রঙিন। চীনা বাদামের গুণাগুণের বিচারে কয়েকটি বিষয়ের উপর নজর দেওয়া হয়। (ক) শাঁসের তেলের পরিমাণ (খ) গোটা খোলার ওজন (গ) চীনা বাদামের রং ও (ঘ) চীনাবাদামের দানার আকার।

বাজারে খান্দেশ অঞ্চলের মালের সবচেয়ে বেশীর কদর। খান্দেশ অঞ্চলে বেশীর ভাগ ফসলই পীনাট জাতের। তামিলনাড়ুতে পীনাট থেকে করমণ্ডল জাতের চাহিদা বেশী। এর প্রধান কারণ হচ্ছে যে পীনাট থেকে পাওয়া তেলে অনেকটা তলানি পড়ে থাকে।

শাসের তেল কি পরিমাণ পাওয়া যাবে সেটা নির্ভর করে কোন সময় ফসল সংগ্রহ করা হয়েছে। সাধারণতঃ ফল বেশ ভাল করে পাকবার এক সপ্তাহ আগে ফসল সংগ্রহ করলে সবচেয়ে বেশী পরিমাণ তেল পাওয়া যায়। সংগ্রহের সময়ের একটু নড় চড় হলেই তেলের পরিমাণ কমে আসে। এছাড়া তেলের গুণাগুণ নির্ভর করে তেলে কি পরিমাণ চর্বিজাতীয় অ্যাসিড থাকে। ভাল শাঁস 0·1% থেকে 0·2% এর বেশী অ্যাসিড থাকে না। বেশী পরিমাণ অ্যাসিড থাকলে দালদা বা মার্গারিন জাতীয় জমান তেল তৈরী করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন জাতের চীনাবাদাম থেকে বিভিন্ন পরিমাণের শাঁস পাওয়া যায়। এর কারণ কোনও কোনও জাতের খোসার পরিমাণ কিংবা খোলার পরিমাণ অনেক বেশী থাকে বলে শাঁসের পরিমাণ কম হয়। গুচ্ছ জাতীয় গাছের ফল থেকে শতকরা প্রায় আশি ভাগ শাঁস পাওয়া যায়। কিন্তু লতান জাতের গাছ থেকে ফলের শতকরা ষাট থেকে পঁচাত্তর ভাগ শাঁস পাওয়া যায় কারণ এর খোসা ও খোলাগুলি মোটা ধরণের। যে সব চীনাবাদাম খাবার জন্য বিক্রি হয় সেগুলির আকার ও রং তাদের বিশেষ সম্পদ। এজন্য বোল্ড ও ভার্জিনিয়ার কদর বেশী।

ভারতে চীনাবাদামের চাষ হয় মৌসুমী ফসল হিসাবে। কোথায়ও কোথায়ও সেচ ভূমিতে চীনাবাদামের চাষ হয়। বালিমাটি, দোঁয়াশমাটি, কাদামাটি প্রভৃতি বিভিন্ন ধরণের মাটিতে চীনাবাদামের চাষ করা চলে। মাটিতে চুনের পরিমাণ কম থাকলে দানাগুলি বড় হয় না। বর্ষা বেশী হলে গাছের বাড় বেশী হয় কিন্তু তখন ফলন হতে দেরী লাগে এবং ফসলও হয় অনেক কম। যে সব অঞ্চলে 12·5 সেমিঃ থেকে 125 সেমিঃ বৃষ্টি হয় সে সব অঞ্চলে চীনা বাদাম ভাল জন্মায়। যে সকল জায়গায় ফেব্রুয়ারী-মার্চ এ বীজ বোনা হয় সে সকল জায়গায় জুন-জুলাই মাসে ফসল তোলা হয়। তামিলনাড়ু, মহারাষ্ট্র, উত্তরপ্রদেশ এবং হায়দ্রাবাদ অঞ্চলে জুন থেকে আগষ্ট হচ্ছে বোনার

সময় আর সেপ্টেম্বর থেকে জানুয়ারী হচ্ছে ফসল তোলার সময়। যদিও চীনাবাদামের জন্য পর্যায় ক্রমের চাষ নিষ্প্রোয়জন। তামিলনাড়ুর অনেক জায়গায় ধান কিংবা তুলার সঙ্গে পাল্টাপাল্টি-ভাবে চীনা বাদামের চাষ করা হয়। অনেক জায়গায় চীনাবাদাম উঠে যাওয়ার পর ভুট্টা, তিল ইত্যাদি ফসল বোনা হয়। চীনাবাদাম প্যাপিলোনেসি গোত্রের গাছ বলে এর চাষের পর মাটিতে নাইট্রোজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ্ জন্য চীনাবাদাম চাষের পর ক্ষেতে পরবর্তী ফসলগুলির উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। সেচ ভূমিতে চীনাবাদামের সঙ্গে অন্যান্য ফসল মিশিয়ে বোনা হয়। চীনাবাদাম ও ক্যাস্টার বা চীনাবাদাম ও অড়হর বেশ ভাল সংমিশ্রণ। গুচ্ছ জাতীর চীনাবাদামের জন্য এক হেক্টর জমিতে প্রায় 125 কেজি বীজের প্রয়োজন। আর লতান জাতের জন্য 95-105 কেজি বীজের দরকার। সেচভূমিতে প্রায় 20% কম পরিমাণ বীজের প্রয়োজন। মৌসুমী বর্ষার পর পরই জমিতে লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে জমি তৈরী করা হয়। কাল মাটির দেশে (Black soil) কিন্তু অন্য পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়। সেখানে মাটি খুঁড়ে বীজ বোনা হয়। বোনার তিন সপ্তাহ পরে যখন ফুল ফোটে তখন একবার, আরও এক মাস পরে আরেকবার আগাছা পরিষ্কার করার জন্যে জমি নিড়ান হয়।

জমিতে গবাদি পশুর সার ব্যবহার করা হয় ফলন বাড়ানোর জন্য। বালি মাটিতে এক হেক্টর জমিতে 35 থেকে 45 মেট্রিক টন পুকুরের বা খালের পাঁক মেশান হয় চাষের বা ফলনের সুবিধার জন্য। পর্যায় চাষের ক্ষেত্রে চীনাবাদামের আগের ফলনের জন্য ব্যবহৃত সার চীনাবাদামের চাষকে প্রভাবিত করে। বোম্বাই বা মধ্যপ্রদেশের কাল মাটিতে নাইট্রোজেন জাতীয় সার ব্যবহার করে খুব বেশী একটা সুফল দেখা যায় নি। আকোলা গবেষণা কেন্দ্রে দেখা গিয়েছে যে পটাশিয়াম সালফেট ব্যবহার করলে চীনাবাদাম উৎপাদন বেশী হয়।

ত্রিবান্দ্রমে কৃষি গবেষণা কেন্দ্রের পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে পটাশ এবং ফসফরাস অ্যাসিড মিশ্রিত সারের ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। যখন চীনাবাদাম পাকতে থাকে তখন গাছের পাতাগুলি শুকিয়ে হলদে হতে থাকে। গুচ্ছ জাতের মালের বেশীর ভাগ ফসলই টেনে তোলা হয়। শুকনো ও শক্ত মাটি থেকে পাচনের সাহায্যে ফল তোলা হয়। লতান জাতের চীনা বাদামগুলো লাঙ্গলের সাহায্যে ক্ষেত থেকে তোলা হয়। সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে ফসলগুলি শুকিয়ে ফেলা হয় কারণ ভিজে ফসলে তৈল জাতীয় অ্যাসিডের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে।

চাষীরা খোলা শুদ্ধ ফসল মিলে বিক্রি করে যদিও খোলা ছাড়ালে পরিবহনের খরচ খানিকটা কম লাগে. খোলা ছাড়ান চীনা বাদামের সহজেই পতঙ্গ বা ছত্রাকের আক্রমণের ভয় থাকে। খোলা ছাড়ানর বিভিন্ন রকম পদ্ধতি আছে। হাতে ছাড়ানর পদ্ধতিতে খোলা ও চীনা বাদাম লাঠি দিয়ে ফাটিয়ে পরে কুলোয় খোলাগুলি আলাদা করা হয়! ভারতের বিভিন্ন জায়গায় চীনা বাদামের ফলনের বেশ তারতম্য দেখা যায়। লতান জাতের চীনা বাদামের ফলন গুচ্ছ জাতের ফলন থেকে বেশী হয়। ভারতে এক হেক্টর জমিতে 625 কেজি থেকে 1200 কেজি পর্যন্ত চীনা বাদাম উৎপন্ন হয়। এ হিসাবে ভারতের ফলন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফলনের কাছাকাছি কিন্তু চীন দেশের তুলনায় অনেক কম। চীন দেশে হেক্টর প্রতি 2000 কেজি পর্যন্ত চীনা বাদাম উৎপন্ন হয়। ভারতে কোনও কোনও গবেষণা কেন্দ্র থেকে এক হেক্টোরে 4000 কেজি পর্যন্ত চীনাবাদাম উৎপন্ন হয় বলে দাবি করা হয়েছে।

চীনাবাদাম যে সব পতঙ্গ ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয় অ্যামস্যাক্টা অ্যালবিসট্রিগা (**Amsacta albistriga**) নামক লাল পতঙ্গ অন্যতম। তামিলনাড়ু অঞ্চলে এই পতঙ্গের উপদ্রব বেশী এবং ফলনের বেশ ক্ষতি

করে। অনেক সময় গোটা খেতের ফসল প্রায় সম্পূর্ণ রূপে ধ্বংস করে। এই পতঙ্গগুলি মাটির ভিতর দিয়ে চলাফেরা করে। সেজন্য আক্রান্ত জমির চারপাশ দিয়ে খাল কেটে অন্যান জমিগুলিকে বাঁচান হয়। যে সমস্ত জমিতে অপরিমিত বা অনিয়মিত বৃষ্টি হয় সেসব জমিতে ষ্টোমোটোরিয়া নেটেরিয়া (Stomoterya neteria) জাতের পতঙ্গের আক্রমণ হতে পারে। এই পতঙ্গগুলি শুকনো আবহাওয়াতে বাড়ে। জোরাল আলো ব্যবহার করে পতঙ্গগুলিকে ধরে মারা হয়। স্ফেনেপটেরা পেরোটিটি (Sphenoptera perotetti) জাতীয় লার্ভার প্রসবে মাটির কাছাকাছি কাণ্ড আক্রান্ত হয়। এ সব ক্ষেত্রে আক্রান্ত গুল্মগুলিকে সরিয়ে দিয়ে খেতের বাকী গুল্মগুলিকে বাঁচান হয়। সেচ ভূমিতেই এই জাতীয় লার্ভার প্রকোপ বেশী দেখা যায়। অ্যাফানাস সরডিডসি (Aphanus sordidis) নামক কীট চীনা বাদামের শাঁস থেকে যথেষ্ট তেল বের করে নেয়। এছাড়া সেরকোস্পোরা জাতীয় (Cercospora sp.) ছত্রাকের আক্রমণে গুল্মের পাতাগুলি হলদে হতে থাকে। বোর্ডে সংমিশ্রণ ব্যবহার করে এই ছত্রাকগুলি থেকে চীনাবাদাম গাছ রক্ষা করা যায়। চীনাবাদাম পাকার সময় কাক ও বন্য শূকর ফসলের যথেষ্ট ক্ষতি করে।

সস্তা প্রোটিন জাতীর খাদ্য হিসাবে চীনাবাদামের যথেষ্ট গুরুত্ব। এতে ভিটামিন বি-1, বি-2, বি-6 এবং নিকোটেনিক অ্যাসিড যথেষ্ট পরিমাণ থাকে। ভিটামিন-সি চীনাবাদামে থাকে না বললেই চলে। চীনাবাদামে লোসিথিন থেকে প্রায় 0·50 to 0·7%। চীনা বাদাম কাঁচা বা ভাজা খাওয়া যায়; লবণ কিংবা মিষ্টি দিয়ে সুস্বাদু করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চীনাবাদামেরর 'পীনাট বাটার' বেশ জনপ্রিয় খাদ্য। খোসা ছাড়িয়ে গুড়ো স্পেনীয় বা ভার্জিনিয়ার চীনাবাদাম এক সঙ্গে করে নানা ধরণের মশলা মিশিয়ে পীনাট বাটার তৈরি করা হয়। শ্যান্ডুইচ এবং বিস্কুটের কারখানার বিভিন্ন রকম খাবার জিনিষ তৈরীর জন্য

'পীনাট বাটার' ব্যবহৃত হয়। পীনাটের ময়দা তুলোবীজ বা সোয়াবীনের ময়দার সঙ্গে মিশিয়ে ময়দার মত ব্যবহার করা যায়।

চীনাবাদামের তেলের জন্য ভারতে চীনা বাদাম বেশী ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য অনেক তেলের তুলনায় বেশী পরিমাণ অসংপৃক্ত অ্যাসিড বা যৌগ থাকে বলে চীনাবাদামের তেল সহজ পাচ্য এবং শরীরের পক্ষে অনেক ভাল। সাধারণতঃ গরুর ঘানি ব্যবহার করে বা রোটারী মিলের সাহায্যে তৈলবীজ পেষাই করা হয়। ঘানিতে বীজগুলি ঠাণ্ডা অবস্থায় পেষাই হয় বলে এতে মিউসিলজ ও অ্যালবুমিন থাকে না বললেই চলে। মিলের তেল থেকে ঘানির তেল খাবার জন্য বেশী পচ্ছন্দসই। ভারতের বাজারে যে তেল ব্যবহৃত হয় তার এক তৃতীয়াংশ আসে ঘানিতে পেষাই করে। এ পদ্ধতিতে তেলে ভিটামিন কম নষ্ট হয়। যদিও মিলে পেষাই করলে ঘানি থেকে অপেক্ষাকৃত বেশী পরিমাণ তেল পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির তরফ থেকে ঘানিতে পেষাই করা বেশী উৎসাহিত করা উচিত কারণ এতে গ্রামের শ্রমজীবিগণের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা থাকে এবং চীনাবাদামের শাঁসের চালানী খরচ খানিকটা কম হয়। রোটারী মিলে পেষাই করে 36-42% তেল পাওয়া যায়। এক্সপেলার মিল থেকে পাওয়া যায় 40-42% আর ঘানি থেকে পাওয়া যায় 35-40%। ভারতীয় উৎপাদনের প্রায় 70% আসে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু ও অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে।

ঠাণ্ডা অবস্থায় হাইড্রোলিক প্রেসে পেষাই করে শাঁস থেকে যে তেল পাওয়া যায় তার রং হয় সোনালী হলদে আর তাতে থাকে মনোরম সুগন্ধ। অনেক সময় রংটা গাঢ়লালচে বা বাদামী রং এর হয়ে থাকে। ভারতে বনস্পতি তৈরীর জন্য চীনাবাদামের তেল ব্যবহৃত হয় তবে আজকাল অন্যান্য অনেক তেল চীনাবাদাম তেলের বিকল্প হিসাবে বনস্পতি শিল্পে ব্যবহৃত হচ্ছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইংলণ্ডে ঠাণ্ডা ভাঙ্গন তেল খাবার বা মার্গারিন তৈরীর জন্যে ব্যবহৃত হয়। ওষুধ পত্রে যে বাদাম তেল ব্যবহৃত হয় সেটা ঠাণ্ডা ভাঙ্গান। তার গুণাগুণ ব্রিটিশ ফারমাকোপিয়তে উল্লেখিত আছে। যে সব ক্ষেত্রে অলিভঅয়েল পাওয়া দুষ্কর সে সব ক্ষেত্রে বাদাম তেল বিকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ফারমাকোপিয়ার পরিশিষ্টে এই তেল বিশুদ্ধ করে ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' এর দ্রবণ তৈরীর জন্য বিধান দেওয়া হয়েছে। সাধারণতঃ 150° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এক ঘণ্টা গরম করে এই তেল বিশুদ্ধ করা হয়। বাদাম তেল পশুর জোলাপ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আজকাল ছত্রাক ও পতঙ্গনাশক দ্রবণে বাদামতেল ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য রকমের ঠাণ্ডা তেলের সঙ্গে মিশিয়ে নীচুস্তরের বাদামতেল সাবান তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া সুগন্ধ দ্রব্যের শিল্পে ও চর্ম শিল্পে বাদাম তেল ব্যবহৃত হয়। ডিজেল তেলের পরিবর্তেও বাদামতেল ব্যবহার করা চলে। তাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই তেল ডিজেল তেলের সমকক্ষ। কিন্তু এতে যন্ত্রে কালি জমা হয় বেশী এবং এর খরচ অত্যধিক।

খাদ্য হিসাবে চীনাবাদাম ও চীনাবাদামের তেলের ব্যবহারে জন্য চীনাবাদাম অনন্য জাতীয় সম্পদ। চীনাবাদামের 9% হজম করা সম্ভব। 100 গ্রাম চীনাবাদাম 549 ক্যালরি সৃষ্টি করতে পারে। চীনাবাদামের প্রোটিন তুলার বীজ কিংবা সোয়াবিনের (Soyabean) সমতুল্য। চীনাবাদামের প্রোটিনের প্রধান উপাদান হচ্ছে অ্যারাচিন ও কোন্যারাচিন। এই প্রোটিনগুলি গ্লোবিউলিন জাতীয় প্রোটিন। শতকরা 25 ভাগ অ্যারাচিন এবং 4% কোন্যারিচিন। প্রোটিন দুটির অ্যামিনো অ্যাসিডগুলি দুধের অ্যামিনো অ্যাসিড উপদানগুলির মত।

চীনাবাদামের তেলের চর্বিজাতীয় অ্যাসিডগুলোর মধ্যে পামিটিক, ষ্টিয়ারিক, অ্যারাসিডিক, বেহেনিক, লিগনোসেরিক, অলিক্ ও

লিনোলিক্ অ্যাসিড অন্যতম। চীনাবাদামের তেলে অসম্পৃক্ততা বেশী থাকায় রক্তচাপের রোগী বা হজমশক্তি যে সব রোগীর কম তাদের পক্ষে ভাল।

খাদ্য ছাড়া চীনাবাদামের প্রোটিন থেকে অ্যারডিল নামক রেয়ন জাতীয় কৃত্রিম সূতো প্রস্তুত করা সম্ভব। এই সূতো দিয়ে উলের মত এক রকমের সূতো তৈরী হয়। এছাড়া প্লাইউড শিল্পে গ্লু তৈরীর জন্য চীনাবাদামের প্রোটিন ব্যবহৃত হয়। পশুখাদ্য হিসাবে চীনাবাদামের খৈল বিশেষ মূল্যবান। খানিকটা গুড় আর শ্বেতসার মিশিয়ে গবাদি পশুর আহার হিসাবে এই খৈল ইউরোপে ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শুয়োরের খাদ্য হিসাবে খৈল বিশেষ সমাদৃত। শুধু চীনাবাদামের শাঁস খাওয়ালে শুয়োরের মাংস নরম হয় কিন্তু খৈল খাওয়ালে তা হয় না। চীনা বাদামের খৈল খেলে মুরগীর বাড় খুব তাড়াতাড়ি হয়। ধান, আম, কফি ও চায়ের খেতে সার হিসাবে আমাদের দেশে চীনাবাদামের খৈল বেশ সমাদৃত। নিকৃষ্ট শ্রেণীর কাডবোর্ড তৈরীর জন্য বা গুঁড়া কর্কের সঙ্গে ভেজাল হিসাবে চীনাবাদামের খোসা ব্যবহৃত হয়।

উৎপাদনের তরফ থেকে তামিলনাড়ু, অন্ধ্রপ্রদেশ, করনাটক, মহারাষ্ট্র, গুজরাট উদ্বৃত্ত এলাকা। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশেও কিছু কিছু চীনাবাদাম উৎপন্ন হয়। তবে বেশির ভাগ মালই অন্যান্য রাজ্যের ন্যায় এই সকল রাজ্য উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে আমদানি করে। যদিও 1940 সাল থেকে চীনাবাদাম রপ্তানি বাণিজ্য চলেছিল বেশ খানিকটা কিন্তু বর্তমানে ভারতে তৈল ও তৈলবীজের চাহিদা অনেক বেশী। ভারতবর্ষ যথেষ্ট পরিমাণ বিভিন্ন ধরণের তেল ও তেলের বীজ বিদেশে থেকে আমদানি করছে। চীনাবাদামের খৈলের চাহিদা এখনও বাইরে আছে। যুক্তরাজ্য এই পণ্যের বড় গ্রাহক।

ছাতিম

ছাতিম গাছ সংস্কৃত ভাষায় সপ্তপর্ণ নামে পরিচিত। কথাটা বোধ হয় ছাতিমের পল্লবে একসঙ্গে সাতটি পাতা থাকে বলে প্রচলিত হয়েছে। গেল শতকে ছাতিম কুইনাইনের পরিবর্তে ম্যালেরিয়াতে ব্যবহৃত হত। ছাতিমের ছাল দিতা ছাল নামেও পরিচিত। আয়ুর্বেদে সপ্তপর্ণ ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে ও পেটের অসুখে ব্যবহৃত হয় বলে নজির আছে।

ছাতিম গাছ উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অ্যালস্টোনিয়া স্কলারিশ আর. বি. আর (Alstonia scholaris R. Br.) নামে পরিচিত। ছাতিম গাছ প্রায় 12 মিটার পর্যন্ত লম্বা এবং পরিধিতে প্রায় 2· মিটার অবধি হয়। গাছটি চিরহরিৎ এবং এর ছালের রং ধূসর। অমসৃণ শাখাগুলি একসঙ্গে কয়েকটা কাণ্ড থেকে বেরিয়ে আসে। একটি পল্লবে তিন থেকে সাতটি করে পাতা থাকে। ভারতের সর্বত্রই প্রায় 900 মিটার পর্যন্ত উঁচু জায়গায় এই গাছ জন্মায়। বেশী সংখ্যক গাছ দেখা যায় ভারতের পশ্চিম উপকূলে। শোভা বর্ধন করার জন্য বাগানে ছাতিম গাছের চাষ করা হয়। ভারতবর্ষ ছাড়া ব্রহ্মদেশে, সিংহল, মালয় ও পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এই গাছ জন্মায়।

ছাতিমের কাঠ কাটলে প্রথমে হলদে রং দেখা যায়। পরে আস্তে আস্তে রংটা লালচে হতে থাকে। কাঠ বেশ পাতলা এবং মসৃণ কিন্তু স্বাদে তেতো। ছাতিম কাঠ ভাল পালিশ নেয় এবং প্লাইউড শিল্পেও বিশেষ ভাবে সমাদৃত। ছাতিমের ফল থেকে রবার ও রজন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়।

ভারতীয় ছাতিমের ছালে শতকরা 0·16 থেকে 0·27 অংশ উপক্ষার থাকে এর মধ্যে 0·08 থেকে 0·10 শতাংশ হচ্ছে এচিট্যামিন।

এচিট্যামিন হাইড্রোক্লোরাইড হিসাবে পৃথক করা হয়। বিশিষ্ট ভারতীয় রসায়নীগণ এচিট্যামিনের গঠন বিন্যাস সংক্রান্ত গবেষণা করেছেন। এঁদের মধ্যে অসীমা চট্টোপাধ্যায়, রামনারায়ণ চক্রবর্তী ও টি. আর. গোবিন্দাচরীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এচিটামিনের দুরূহ গঠন বিন্যাস সমাধান করেন বার্চ প্রমুখ রসায়নী। ছাতিম গাছের অন্যান্য উপক্ষারে অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই গাছ থেকে প্রায় বারটি উপক্ষার পৃথক করে সেগুলোর গঠন বিন্যাস স্থির করেছেন চট্টোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মীগণ। এই সমস্ত উপক্ষারগুলিই ইণ্ডোল গোষ্ঠির অনন্য সাধারণ উপক্ষার।

কুইনাইন বা এমিটিনের মত ছাতিমের উপক্ষারের অ্যমিবার উপর কোনও ক্রিয়া নেই। বেকন এর কারণ দেখিয়েছেন যে এচিট্যামিন প্রোটোপ্লাজমের উপর বিষক্রিয়া শূন্য। এচিট্যামিন পাখীর ম্যালেরিয়াতে মৃদুভাবে কার্যকরী। বিভিন্ন ভারতীয় গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে এচিট্যামিন ম্যালেরিয়াতে কার্যকরী নয়। ইঁদুরের দেহে এচিট্যামিনের বিষক্রিয়া দেখা যায়। ইঁদুরের প্রতি 20 গ্রাম ওজনের জন্য 0·3 থেকে 0·5 মিলিগ্রাম এচিট্যামিন বিষক্রিয়া সম্পন্ন। বিড়াল, বাঁদর ও কুকুরের উপর পরীক্ষা করে মুখার্জি প্রমুখ বিজ্ঞানীগণ দেখিয়েছেন যে এচিট্যামিনের প্রভাবে রক্তচাপের সাময়িক হ্রাস হয় কিন্তু কিছুক্ষণ পরে আবার সেটা বেড়ে যায়। রক্তের শর্করা জাতীয় পদার্থ কমাতে পারে এমন একটা যৌগ ছাতিম গাছে আছে। ভারতীয় ফারমাসিউটিক্যাল কোডেক্সে (1959) ডাঃ বি. মুখার্জি ছাতিম গাছের ছালের নিষ্কাশন ম্যালেরিয়া এবং পুরান পেটের অসুখে ফলপ্রদ বলে বর্ণিত হয়েছে। ছাতিমের নিষ্কাশনের প্রভাবে শরীরের তাপ কমে এবং রোগীর কোনও রকম অবসাদের লক্ষণ দেখা যায় না। ইপিকার সংমিশ্রণে ছাতিমের নিষ্কাশন পেটের অসুখে বিশেষ ফলপ্রদ। এ ছাড়া চর্মরোগে এর ব্যবহারের কথা ডাঃ মুখার্জি উল্লেখ

করেছেন। 125 গ্রাম ছালের গুঁড়া আর এক লিটার 60% সুরাসার ভালভাবে মিশিয়ে টিনচার অ্যালসটোনিয়া তৈরী হয়। এই টিনচারে শতকরা 52·5 ভাগ সুরাসার থাকবে। 30 থেকে 60 ফোঁটা টিনচার একবারে সেব্য।

নিম

সমুদ্র মন্থন করে যে অমৃত সিঞ্চিত হয়েছিল তারই কয়েক ফোঁটা নাকি নিম গাছের উপর পড়েছিল। তাই অমৃত সম বৃক্ষের পাতা নানা রকম রোগ মুক্তির জন্য অমোঘ বলে কথিত। এই রকম একটা বিশ্বাসকে পাথেয় করে ভারতের কোথাও কোথাও হিন্দুগণ বছরের প্রথম দিনে নিমের পাতা খায় সারা বছর ধরে নীরোগ থাকার জন্যে। হিন্দুগণের কাছে নিমগাছ দেব মন্দিরের অর্ঘ্য হিসাবে এবং নানা রকম ক্রিয়াকর্মে ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে বেশ প্রচলিত। ঘট স্থাপন পর্বে বিশেষ করে মহীশূর এলাকায় নিমের ডালের বিশেষ ভূমিকা আছে। পূজামণ্ডপে নিমের কয়েকটি ডাল এবং নারকেল নিয়ে তৈরী হয় অর্ঘ্য এবং এই অর্ঘ্যকে কেন্দ্র করে সুরু হয় উৎসব। প্রায় তিন চার দিন ধরে চলে এই ঘটস্থাপন পর্ব। সমাজ জীবনের নানা রকম ক্রিয়া কর্মের মধ্যে এক সময় ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে নিমগাছ প্রাত্যহিক জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে সমাদৃত ছিল। সুশ্রুত এবং চক্রদত্ত প্রভৃতি চিকিৎসা শাস্ত্র গ্রন্থে নিমের বিভিন্ন ব্যবহারের কথা লিপিবদ্ধ আছে। মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে আসে তখন তাঁরা নিমের গুণাবলী দ্বারা আকৃষ্ট হয়। পারস্য দেশের Azadarch গাছের নাম অনুসারে তাঁরা নিমগাছের নাম দিয়েছিলেন Azzadarah-i-undi। গাছের বনৌষধি হিসাবে গুণাগুণ তাঁরা জানতে পারেন ভারতভূমি থেকে। নিমের ছালের ব্যবহার ইউরোপ থেকে আগত পর্যটকদের আকৃষ্ট করেছিল। তাই ফ্রা কার্থোলিম, সোনেপেট, গার্শিয়া-দে-অর্তা প্রমুখ লোকের বৃত্তান্তে নিম স্থান পেয়েছিল। কিন্তু নিমের গুণের অন্যতম সমঝদার ছিলেন বম্বের ডাঃ হোয়াইট। তাঁর উৎসাহে গেল শতকে নিমের বহুল প্রচার প্রচলন আরম্ভ হয় আধুনিক বনৌষধিতে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে নিমগাছ অ্যাজা ডিরেক্টা ইণ্ডিকা এ জাস, নামে পরিচিত (Azadirachta indica A. Juss.) ও মিলিয়াসি (Maliaceac) গোত্রের এক বিশেষ প্রজাতি। গাছগুলি মাঝারি ধরণের 'এবং প্রায় 15 মিটার লম্বা হয়। যদিও চিরহরিৎ বলে এই গাছ বর্ণিত হয় কোথাও কোথাও এই গাছ পর্ণমোচী। নিমগাছের ছাল বেশ মোটা হয়। এর বহিরাবরণ ধূসর এবং ভিতরের দিকটা লালচে। মার্চ থেকে মে মাসের মধ্যে গাছে ফুল ধরে ও জুন থেকে আগষ্ট মাসের মধ্যে ফল পাকে। ফলগুলি সবুজ ও হলদে রঙের হয় এবং এতে একটি মাত্র বীজ থাকে। ভারতবর্ষে অনেক জায়গায় গাছটি বন্য হিসাবে পাওয়া যায় কিন্তু কোথাও কোথাও এর চাষ হয়। দাক্ষিনাত্যের কাল মাটি এই গাছ জন্মানর পক্ষে অনুকূল। শুষ্ক মরুঅঞ্চলে যেখানে বৃষ্টি 45 থেকে 112 সেমিঃ সর্ব্বোচ তাপ প্রায় 120 ডিগ্রি ফাঃ সে সব জায়গায় নিমগাছ ভালভাবে জন্মায়। সেজন্য মরু বা মরু প্রায় অঞ্চলে বন স্থাপনে বা মরুঅঞ্চলের অগ্রগতি রোধকরার জন্য নিমগাছ রোপণ করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে সব অঞ্চলে অনেক সার ব্যবহার করে অন্যান্য কৃষিজ ফসল জন্মান সম্ভব নয় সেখানে নিম চাষ করা যায়। এছাড়া নিম শুষ্ক বালি মাটি থেকে এর শিকড়ের মধ্য দিয়ে রস সংগ্রহ করতে পারে এবং যতটা খাদ্য নিজেকে রক্ষা করার জন্য মাটি থেকে গ্রহণ করে সবটাই প্রায় নাইট্রোজন ও ফসফরাস হিসাবে পাতার মাধ্যমে ফিরিয়ে দেয়। এই সব কারণে নাইজেরিয়া কিংবা সাহারা সংলগ্ন পশ্চিম আফ্রিকাতে বিশেষ করে সাভানা অঞ্চলে নিমের চাষ নানাভাবে ফলপ্রসূ হয়েছে। নিমগাছে বাকল বিভিন্ন অংশ থেকে পাওয়া বাণিজ্যিক পদার্থসমূহ গ্রামীণ শিল্পে ও অর্থনীতিতে বিশেষভাবে সহায়ক।

নিমের তেল সাবান তৈরীর পক্ষে অনেক ভোজ্য তেল থেকে বেশী উপযোগী। ভারতে নিমের তেল সাধারণতঃ ঘানিতে পেষাই

করে বের করা হয়। তবে যে সাবান তৈরী হয় তাতে তেতো স্বাদ ও উগ্রগন্ধ থাকে। নিমের তেল বের করে নেওয়ার পর বীজ থেকে যে খৈল পাওয়া যায় তাতে যথেষ্ট প্রোটিন থাকে এবং সার হিসাবে বিশেষ কদরে ব্যবহৃত হয়। এই খৈলের সার হিসাবে মূল্য থেকেও জমিতে অন্যান্য কীট থেকে ফসলকে বাঁচায় বলে কৃষকগণ এই খৈল বেশী পচ্ছন্দ করে। শুধুমাত্র নিমের খৈলই যে কীটরোধক হিসাবে ব্যবহৃত তা নয়। মহীশূর অঞ্চলে পাতা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে কাদার মতকরে ধানের ক্ষেতে চারা রোপণের আগে মাটির সঙ্গে ভালভাবে মিশিয়ে দেওয়া হয়। এতে ধানগুলির পক্ষে এই ব্যবস্থা কীটনাশক হিসাবে কাজ করে। খুব কম খরচে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব। নিমের বাকল থেকে যে গঁদ বের হয় সেটা ছোট ছোট খণ্ডে সংগ্রহ করা হয়। এটি বাদামী রং বিশিষ্ঠ ও স্বচ্ছ। সাধারণতঃ খাঁটি গঁদের সঙ্গে এই গঁদ ভেজাল হিসাবে চালান হয়। নিম গাছের উপরিভাগ থেকে একরকম তাড়ি পাওয়া যায়। এই তাড়িতে নিমজাত দুর্গন্ধ থাকে। সাধারণতঃ নিমের কাঠ অত্যন্ত ভারী ও মজবুত হয়। সাদা পিঁপড়ে এই কাঠকে আক্রমণ করতে পারে না। এই কাঠ ভাল পালিশ নেয় না। নিমের ফলের মণ্ড মিথেন গ্যাস তৈরীর পক্ষে উপযুক্ত কাঁচামাল।

কৃষিজ গুরুত্বের জন্য আজ নিমগাছ সারা পৃথিবীতে অনন্য সম্পদ হিসাবে গণ্য কিন্তু বনৌষধি হিসাবে পুরাকাল থেকে নিমগাছ বিভিন্ন পুরাণ পুঁথি ও চিকিৎসা শাস্ত্রের গ্রন্থে বিশেষভাবে উল্লেখিত। নিমগাছের প্রায় সব অংশই কোনও না কোনও রোগে ব্যবহৃত হয়। নিমের তেল বিভিন্ন রকম ঘা, দাদ প্রভৃতি অসুখে ব্যবহৃত হয়। নিমের ছাল বিভিন্ন রকম চর্মরোগে বিশেষ ফলপ্রদ। পাতা ব্যবহৃত হয় কাটা ঘাতে এবং বিভিন্ন ধরণের ফোড়াতে। সাধারণতঃ পাতা দিয়ে পলটিস তৈরী করে ফোড়া বা কাটাঘাতে লাগান হয়। এ ছাড়া পাতার নির্যাস তৈরী করে অনেক সময় চার্মোরোগে ব্যবহার করা হয়। নিম মধুমেহ রোগের এবং ভাইরাস জনিত রোগের বিরুদ্ধেও ব্যবহৃত হয়

বলে কথিত হয়। এছাড়া পেটের নানারকম উপসর্গে নিমের পাতা ব্যবহৃত হয়। ম্যালেরিয়া জ্বরে নিমের বাকল বিশেষ ফলপ্রদ বলে কথিত হয়।

নিমের তেলের রাসায়নিক পরীক্ষা প্রথমে সিদ্দিকি ও মিত্র করেছিলেন। এই তেল থেকে তাঁরা কতগুলি তেতো উপাদান পৃথক করেন। তেলের চর্বিজাতীয় অ্যাসিড হচ্ছে অলিয়িক, ষ্টীয়ারিক, পামিটিক অ্যাসিড। এছাড়া এতে স্বল্প পরিমাণে অ্যারকিডিক অ্যাসিড এবং লিনোলিক অ্যাসিডও আছে। নিমে অনেকগুলি তেতো যৌগের খোঁজ পাওয়া গিয়েছে। প্রথমদিকে ভারতীয় রসায়নীগণ কয়েকটা যৌগ আবিষ্কার করে এর মধ্যে মিত্র প্রমূখ রসায়নী নিম্বিডিন আলাদা করেন। এতে সালফার আছে। এছাড়া অন্যান্য যৌগের মধ্যে নিম্বিয়ল ও নিম্বিন উল্লেখযোগ্য। নিম্বিনের গঠন বিন্যাস নারায়ণ প্রমুখ ভারতীয় রসায়নী স্থির করেন তবে তার আগে নিম্বন সংক্রান্ত গবেষণায় সেনগুপ্ত ও খাস্তগীর বেশ খানিকটা কাজ করেছেন।

জার্মান গবেষকগণ নিমের রসায়নে নতুন দিগন্ত সৃষ্টি করেছেন। নিমগাছ থেকে অনেকগুলি যৌগ আলাদা-করেছেন যা পতঙ্গের নিমের পাতা খাবার অনীহা সৃষ্টি করে। জাপানী বিজ্ঞানী নাকানিশি সবচেয়ে বেশী খাদ্য অনীহা সৃষ্টিকারী যৌগ (Antifeedant) আলাদা করেছেন যার নাম অ্যাজাডিরেকটিন। নিম্বিডিন দিয়ে তৈরী ঔষধ চর্মরোগে ব্যবহৃত হয়। দূষিত ঘা, পোড়া ঘা রক্তপাত জনিত মাড়ির দোষে নিম্বিডিন বিশেষ ফলপ্রদ, পাইয়োরিয়াতেও এটি উপকারী।

নিমের বাকল তেতো এবং টনিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও ম্যালেরিয়া জ্বরে এই বাকল ফলপ্রদ বলে কথিত হয় কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনের গবেষণা থেকে জানা যায় যে নিমের

পাতার বা বাকলের নিষ্কাশন বানরের বা মানুষের ম্যালেরিয়াতে কার্যকরী নয়। নিমের পাতা ভেজে তরকারীর সঙ্গে খাওয়া হয় নানা রকম রোগের প্রতিষেধক হিসাবে।

সমুদ্র মন্থনের কিম্বদন্তী থেকে আরম্ভ করে আজকের বিজ্ঞান সম্মত গবেষণার মধ্যদিয়ে নিমগাছ অন্যান্য কৃষিজ পণ্য হিসাবে সারা বিশ্বে সমাদৃত। বনৌষধি হিসাবে ব্যবহার উত্তরোত্তর বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সাধারণের দৈনন্দিন প্রয়োজনে নিমগাছ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

পেঁয়াজ

পেঁয়াজের আদি বসতি পশ্চিম এশিয়ার দেশগুলি। সেখান থেকে অনেক কাল আগেই পেঁয়াজ গ্রীস ও ইটালিতে প্রবর্তিত হয়। মিশরে পেঁয়াজ প্রবর্তিত হয় অনেক পরে। বিশ্ববিখ্যাত গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডেটাশ প্রাচীন এক অনুশাসন থেকে উল্লেখ করেছেন যে মিশরের বৃহৎ পিরামিড তৈরীর সময় প্রায় 214,400 কেজি পেঁয়াজ ব্যবহৃত হয়েছিল কারিগরদের খাবার হিসাবে। অর্থাৎ প্রায় 3000 খৃস্টপূর্বাব্দে মিশরে পেঁয়াজ পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রচলিত হয়। পরবর্তীকালের পুঁথিপত্রে জানা যায় যে মোজেসের সময় মিশরে পেঁয়াজ প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষে পেঁয়াজ অনেকদিন আগেই আসে। সব্জী ও মশলা হিসাবে আমাদের দেশে পেঁয়াজের ব্যবহার অনেকদিনের কিন্তু কোনও কারণে এ শতাব্দির প্রথম দিক পর্যন্ত গোঁড়া হিন্দুগণ পেঁয়াজ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে নারাজ ছিল। তবে অবিভক্ত বাংলা দেশে পেঁয়াজ-পান্তা কৃষকদের খাদ্যের অনন্য অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত ছিল।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে পেঁয়াজ অ্যালিয়াম সেপা লিন্ (Allium cepa **Linn.)** নামে পরিচিত। ভারতের সর্বত্রই পেঁয়াজ জন্মে এবং বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন মহারাষ্ট্রে কান্দ, তামিল বা তেলেগুতে নিরুলি, হিন্দিতে ও বাঙ্গলা ভাষায় পেঁয়াজ বলেই পরিচিত। পেঁয়াজ গাছ কন্দযুক্ত, দ্বিবর্ষজীবী গুল্ম। কন্দর উপর থেকে ফাঁপা, বেলনাকার পাতা সোজা উঠে আসে আর তার ডগাতে সাদা পুষ্পগুচ্ছ থাকে। পরে ফুলগুলির মধ্যে কাল বীজযুক্ত ফল হয়। মাটির নিচের কন্দই পেঁয়াজের ফসল। কন্দগুলির আকার এবং রং বিভিন্ন ধরণের হয়। সব্জী বা মশলা হিসাবে পেঁয়াজের বহুল ব্যবহারের জন্য ইহা ভারতের অনন্য কৃষি সম্পদ।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় পেঁয়াজের চাষ হয়। মাঠে কিংবা বাগানে সব জায়গাতেই এর চাষ সম্ভব। আখ এবং হলুদ—প্রভৃতি কৃষিজ পণ্যের সঙ্গে একই সাথে পেঁয়াজের চাষ করা চলে আবার পর্যায় ক্রমে চাষ করা চলে ধান, ধনে, ও রসুনের সঙ্গে। শীতকালের সব্জী হিসাবে আমদানি করা পেঁয়াজের চাষ সাধারণতঃ বাগানে হয়ে থাকে।

বীজ থেকে চারা তৈরী করে এবং সেই চারা রোপণ করে পেঁয়াজের চাষ করা যায় কিংবা কন্দ বুনে চাষ করা যায়। 9 থেকে 11 কেজি বীজ থেকে যতগুলি চারা তৈরী হয় তা এক হেক্টর জমির পক্ষে যথেষ্ট। সাধারণতঃ উত্তর ভারতে চারা রোপণ করেই চাষ করা হয়। 0·8 থেকে 1·2 সেমি লম্বা হলে চারাগুলি রোপণ করা হয়। দক্ষিণ ভারত কিংবা পশ্চিমবঙ্গে কন্দ বুনে চাষ করা হয় এক হেক্টর জমির জন্য 850 থেকে 1100 কেজি কন্দ প্রয়োজন। সে হিসেবে এই পদ্ধতি অনেক বেশী খরচ সাপেক্ষ। দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিমবঙ্গে মৌসুমী ঋতুর শেষ দিক থেকে গরম কালের আগে পর্যন্ত কন্দ বোনা চলে।

পরিমিত ভাবে সার দেওয়া দোআঁশ মাটি, শুকনো আবহাওয়া পেঁয়াজের অনুকূল। বপন কিংবা রোপণের পূর্বে ভালভাবে মাটিতে লাঙ্গল দিয়ে 15 দিন পরপর জল সেচ করলে অধিক উৎপাদন সম্ভব। এই রকম জল সেচ করলে যমজ কন্দ কম জন্মে।

পেঁয়াজের উপযুক্ত সার হচ্ছে মাছের সার, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সোডিয়াম ও পটাসিয়াম নাইট্রেট। হেক্টর প্রতি 125 কেজি পটাসিয়াম সালফেট প্রয়োগ করলে কন্দগুলির গুণগত ও পরিমাণের দিক দিয়ে যথেষ্ট উন্নতি হয়।

পেঁয়াজের কন্দগুলি যখন প্রায় পেকে আসে, পেয়াজের কলি না ভেঙ্গে মুড়ে দেওয়া হয়। এর ফলে কন্দগুলি বেশ ফুলে উঠতে পারে।

যখন পাতাগুলি সম্পূর্ণভাবে শুকিয়ে যায় তখন কন্দগুলির তোলার সময় হয়। সাধারণতঃ বীজ থেকে বোনার ৪ মাসের মধ্যে আর কন্দ থেকে বোনার তিন মাসের মধ্যে পণ্য সংগ্রহ করা হয়। 8,000 থেকে 17,000 কেজি কন্দ এক হেক্টর জমি থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। সংগ্রহের পর শুকিয়ে পেঁয়াজ ঠিক মত গুদাম জাত করলে বহুকাল রাখা যায়।

ভারতীয় পেঁয়াজের বড় রকমের পোকামাকড় আক্রমণের ভয় নেই। সাধারণতঃ কয়েক রকম ছত্রাকের আক্রমণ সচরাচর নজরে আসে। অলটারনেরিয়া পালুণ্ডি (Alternaria pallundi), অ্যাসপারজিলোস নাইজার (Aspergillus niger), এরাইসিফিটাউরিকা (Erysiphe-taurica) এবং পাকসিনিয়া পোরি (Puccinia porri) প্রভৃতি ছত্রাক সাধারণতঃ পেঁয়াজের পক্ষে মারাত্মক। শুকনো ডগা পুড়িয়ে ও ঠিকমত গন্ধক ছিটিয়ে আক্রমণ রোধ করা যায়।

থ্রিপস এর (Thrips tabaci) আক্রমণ রোধ করা যায় তামাকের নির্যাস ছিটিয়ে। এই পোকাগুলি রসশুষে নেয় পাতা থেকে। ল্যাফাইগ্‌মা এক্সিগনা নামক (Laphygma exigna) পোকা পাতা নষ্ট করে। এগুলো হাতে তুলে নষ্ট করে ফেলা হয়।

সাধারণতঃ দু'রকমের পেঁয়াজের কদর বেশী। পাটনাই পেঁয়াজ আর তার থেকে বড় রকমের লাল পেঁয়াজ। এছাড়া বোম্বাই অঞ্চলে থেকে আর এক রকম পেঁয়াজ পাওয়া যায় তার নাম বোম্বাই পেঁয়াজ। সাদা খোসার পেঁয়াজে ঝাল কম হয় কিন্তু গন্ধ ভাল। বেশী লালচে খোসার পেঁয়াজ বেশ ঝাঁজাল কিন্তু বেশীদিন ভাল থাকে কারণ খোসাতে প্রোটোক্যাট্যাচুইক অ্যাসিড এবং ক্যাটাকল থাকে বলে ছত্রাক আক্রমণ রোধ করতে পারে বেশী। এছাড়া কতগুলি বিদেশী জাতের পেঁয়াজ যা ভারতের বিভিন্ন জায়গার বাগানে সীমিত ভাবে চাষ হয় সেগুলি

বিশেষ ভাবে সমাদৃত। এই সকল জাতের মধে স্পেনীয়, বার্মুডা, সুটনেরA-1, ত্রিপলি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখ যোগ্য।

আয়ুর্বেদ ও য়ুনানী শাস্ত্রে পেঁয়াজের কফ্ জনিত বিভিন্ন রকম উপসর্গে ব্যবহারের নির্দেশ পাওয়া যায়। অনেক বিশারদগণ মনে করেন পেঁয়াজ মূত্র বৃদ্ধি কারক ও উত্তেজক। গত শতাব্দির ভারতীয় চিকিৎসকগণ পেঁয়াজের ব্যবহার সম্বন্ধে নানারূপ অভিমত প্রকাশ করেছেন। শাজাহানপুরের এফ. ম্যাককোগির অভিমত হচ্ছে পেঁয়াজের ব্যবহারে আন্ত্রিক স্পন্দন বেড়ে যায়। এছাড়া নানা ধরণের রক্তপাত জনিত উপসর্গে এর ব্যবহার হয়ে থাকে। সরিষার তেলের সঙ্গে নানা রকম বাত ব্যাধিতে মালিশ হিসাবে ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন ডঃ অন্নদা চরণ মুখার্জি। কামাল ও বিস্তৃত প্লীহা রোগেও পেঁয়াজের ব্যবহারের নজীর পাওয়া যায়। স্কার্ভি রোগ, রক্তঅর্শে এবং আমাশয়ে পেঁয়াজ ব্যবহারের কথা উল্লেখিত আছে। ফিট হলে পেঁয়াজ রোগীর সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে।

ইউরোপে রঞ্জন শিল্পে পেঁয়াজের ব্যবহার হত অনেকদিন থেকেই পাকা হলুদ রং করার জন্য। পার্কিন (1899) এ পেঁয়াজের খোসা থেকে কোয়েসিট্রিন নামক হলদে রং পৃথক করেন। পেঁয়াজের দুর্গন্ধ যুক্ত উদ্বায়ী তেলের প্রধান উপাদান হচ্ছে অ্যালইল আইসো-প্রোপাইল সালফাইড এছাড়া আরেকটা উপাদান হচ্ছে এন-প্রোপাইল থায়োল। গ্যাসীয় ক্রোমাটোগ্রাফিক পদ্ধতি ব্যবহার করে জানা গিয়েছে যে পেঁয়াজে মিথাইল অ্যালকোহল, প্রোপিয়ন অ্যালডিহাইড, এন-প্রোপাইল থায়োল, হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যাসিট্যালডিহাইড সালফার ডাইঅক্সাইড, ডাইপ্রোপাইল ডাইসালফাইড, হাইড্রোক্সি প্রোপান থায়োল, 4-হেক্সিনিল অ্যালডিহাইড, স্লাইক্লো অ্যালিন, s-মিথাইল সিষ্টিন সালফোক্সাইড, S-n- প্রোপাইল সিষ্টিন সালফো-ক্সাইড আছে। এছাড়া ফিনল্যাণ্ডের নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী ফিয়ারটেনেন

অনেকগুলি গামা-গ্লুটামিল পেপটাইড পেঁয়াজের কন্দ থেকে পৃথক করেছেন। পেঁয়াজ ছাড়ানর সময় চোখ জ্বালা করে জল বেরিয়ে আসে। যে রাসায়নিক যৌগের প্রভাবে এরকম হয় সেটা খুবই স্বল্পস্থায়ী। এটি সহজেই ভেঙ্গে প্রোপিয়ন অ্যালডিহাইড ও 2-মিথাইল-2-পোটিনাল সৃষ্টি করে। সম্ভবত চোখের জল বের করার জন্য দায়ী প্রোপিনসালফেনিক অ্যাসিড। সালফার ঘটিত যৌগের মধ্যে S (1-প্রোপিনিল)-সিষ্টিন সালফোক্সাইড একটি গুরুত্ব সম্পন্ন যৌগ। পেপটাইড গুলো কন্দেই পাওয়া যায় তবে সব সময় নয়।

সদ্য সদ্য তৈরী করা পেঁয়াজের সমসত্বমণ্ডের জীবাণু ধ্বংসের ক্ষমতা আছে। 50 থেকে 100 মিলিগ্রাম মণ্ড জীবাণুবৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে পারে। পেঁয়াজের মূত্রবৃদ্ধি করার ক্ষমতা এর গ্লাইকোলিক অ্যাসিডের জন্য। বড় পেঁয়াজে সাধারণতঃ 86.8% জল, 1.2% প্রোটিন ; 11.6% শর্করা জাতীয় পদার্থ, 0.18% ক্যালসিয়াম, 0.08% ফসফরাস, 07 মিলিগ্রাম % লৌহ, 25 ইউনিট ভিটামিন এ, 40 ইউনিট ভিটামিন-বি ও 11 মিলিগ্রাম % ভিটামিন সি আছে।

ভারত নিজের চাহিদা মিটিয়েও বেশ কিছু পরিমাণ পেঁয়াজ রপ্তানী করে। বোম্বাই ও মাদ্রাজ থেকে বেশীর ভাগ মাল বিদেশে রপ্তানী করা হয়।

বচ্

গ্রীকচিকিৎসক হিপোক্রিটাসের আমলেও ওষুধ হিসাবে বচের ব্যবহারের উল্লেখ আছে। গেল শতকে স্কটল্যাণ্ড ও ইংলণ্ডের অভিনেতা ও অভিনেত্রীদের মধ্যে বচের ব্যবহার বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। অভিনয়ের সময় স্বরভঙ্গ বা গলার ব্যাথার জন্য কোনও অস্বস্তি বা অসুবিধা দূর করার জন্য তাঁরা বচ ব্যবহার করতেন।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বচের নাম অ্যাকোরাস ক্যালামাস লিন্ (Acorus calamus Linn.) নামে পরিচিত। গাছটি অ্যারাসি গোত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই গাছের আদি বসতি উত্তর এশিয়া অঞ্চলে। বনৌষধটি জলাভূমিতে বা অর্ধজলাভূমিতে জন্মায়। গাছটি লতায়িত শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত এবং বেশ কয়েক বছর বাঁচে। মূলগ্রন্থি লম্বাকৃতি ও একটু শক্ত। মূলগ্রস্থির রং বাইরের দিকে পাটকিলে কিংবা ফিকে গেরুয়া কিন্তু ভিতরটা সাদা ও স্পঞ্জের মত। সাধারণতঃ বচ্ বলে যা বাজারে কেনাবেচা চলে সেটা হল বচের মূল বা মূলগ্রন্থি। ভারতের বাজারে বচ্ আয়ুর্বেদ ওষুধ বা ওষুধের উপাদান হিসাবে বেশী ব্যবহৃত হয় কিন্তু ইউরোপে এর ব্যবহার বিয়ার সুগন্ধ করার জন্য। ভারতেও অনেক ক্ষেত্রে মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ভারত ও সিংহলের নানা জায়গায় বচ্ জন্মায়। নাগা পার্বত্য অঞ্চলে, মনিপুরে ও কাশ্মীরের জলাভূমিতে এই গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। প্রায় 18,00 মিটার উঁচু অঞ্চল পর্যন্ত বচ্ জন্মায়। বাজারের চাহিদার বেশী অংশ মেটান হয় বন্য সরবরাহ থেকে কিন্তু আবাদি জমির বনৌষধও খানিকটা বাজারের চাহিদা মেটায়। কর্ণাটকের কোটাগিরি অঞ্চলে মূলগ্রন্থির চাষ করা হয়। বচের চাষের জন্য

পলিমাটি বেশী উপযুক্ত। মাঠে জল সেচ করা হয় লাঙ্গল দিয়ে এবং সবুজ সার ব্যবহার করে চাষের উপযুক্ত জমি তৈরী করা হয়। আগের বছরের ফলনের শেষ অংশ এক ফুট পর পর বুনে দেওয়া হয়। এক বছরের মধ্যে ফসল সংগ্রহের উপযুক্ত হয়। এর পর মাটি খুঁড়ে মূলগ্রন্থি সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু খানিকটা অংশ রেখে দেওয়া হয় পরবর্তী বছরের ফসল উৎপাদনের জন্য। এক হেক্টর জমিতে প্রায় চার মেট্রিক টন পরিমাণ বাজারের উপযুক্ত মূল গ্রন্থি পাওয়া যায়।

আয়ুর্বেদে বচের মূল গ্রন্থি ঝাঁজাল, কোষ্ঠ পরিস্কারক, মূত্রবৃদ্ধি-কারক বলে উল্লেখিত আছে। গেল শতকে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের চিকিৎসকগণ নানারকম অসুখে বচ্ ব্যবহার করেছেন। শ্রীরামপুরের প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ উমেশচন্দ্র দত্ত পেটের নানা রকম অসুখে বচের ব্যবহারের নির্দেশ দিতেন। মীরাটের টি. এন. ঘোষ বলে গেছেন যে ভাঙ ও জোয়ানের সঙ্গে সমপরিমাণ বচ্ মিশিয়ে বেদনাদায়ক অর্শে ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। কথিত হয় বচের গন্ধ গোখরো সাপ সহ্য করতে পারেনা। বচের গন্ধে সাপের মাদকতা আসে। তাই সাপুড়েরা গোখরো সাপের আবাসের কাছে বচের চাষ করে। বক্ষঃপীড়া ও শ্লেষ্মাজনিত নানা রকম অসুখে বচ্ ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শন পাওয়া যায়। মাদ্রাজের ডাঃ মহীউদ্দিন শরীফের বিবরণী এ বিষয়ে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাঃ শরীফ বলেছেন পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে বচ্ ব্যবহার করলে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মূলগ্রন্থি থেকে শতকরা 1·5 থেকে 3.5 অংশ উদ্বায়ী তেল পাওয়া যায়। এই তেলের অন্যতম উপাদান হচ্ছে অ্যাসারোন (82%), ক্যালমিনিত্তনল (5%), ক্যালামিন (4%), ক্যালামান (1%)। সামান্য পরিমাণে মিথাইল ইউজিনল, ইউজিনল, আলফা-পাইনিন, অ্যাসারোন অ্যালডিহাইড, বিউট্রিক এষ্টার। এছাড়া পাওয়া গিয়েছে ক্যালামল, অ্যাকরিন এবং অ্যাকোরোন।

বচের সুরাসারে ছত্রাক নিরোধ ক্ষমতা আছে। বচের দ্রাবক নিষ্কাশন এবং উদ্বায়ী যৌগগুলি মাছি ও মশার পক্ষে মারাত্মক। ডি. ডি. টির সঙ্গে ব্যবহার করলে ডি. ডি. টির জীবাণু ধ্বংসের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেয়। এই সকল বিষক্রিয়ায় বচের উপাদান ট্রান্স অ্যাসারোনের জন্য।

বাসক

বিগত শতাব্দির বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ ইউ. সি. দত্ত তাঁর 'হিন্দু মেটিরিয়া মেডিকাতে' উল্লেখ করেছেন যে যত দিন বাসক গাছ আছে ততদিন যক্ষ্মারোগীদের হতাশ হবার কারণ নেই। এই প্রবাদ বাক্যের বৈজ্ঞানিক সত্যতা না থাকলেও এটা সত্য যে বাসক গাছ প্রাচীনকাল থেকেই অন্যতম ভেষজ হিসাবে ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে সমাদর লাভ করে এসেছে।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে বাসকের নাম অ্যাডাটোডা ভ্যাসিকা নীস (Adhatoda vasica Nees.)। গাছগুলি অ্যাকান্থেসি গোত্রের ছোট ছোট গুল্ম। এক সঙ্গে অনেকগুলি জন্মায়। ভারতের সর্বত্র প্রায় 1200 মিটার উচুঁ স্থানে পর্যন্ত জন্মায়। শীতকালে গাছের ফুল ফোটে, কাণ্ড বেশ সোজা মসৃণ আর ছাই রঙের, ফুলগুলি সাদা রঙের, পাতাগুলি চওড়া বর্শাকৃতির। ভারতের বিভিন্ন অংশে বাসক গাছ বিভিন্ন ভাষায় পরিচিত। তামিল ভাষায় গাছটি অ্যাডাটোডাই নামে পরিচিত। তামিল নাম থেকে উদ্ভিদ বিজ্ঞানের নামকরণ হয়েছে।

আয়ুর্বেদের শার্ঙ্গধর ও ভাবপ্রকাশ গ্রন্থের উল্লেখ করে ইউ. সি. দত্ত বাসক গাছের নানা ধরণের ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। সাধারণতঃ হাঁপানি, সর্দি, কাশিতে এই গাছের বিভিন্ন অংশের ব্যবহারের নির্দেশ পাওয়া যায়। পারস্য দেশীয় বিশারদগণ ভারতের বাসকের উপর বিশেষ আস্থা প্রকাশ করেছেন। Makhzan-et-Adwiya গ্রন্থের গ্রন্থকার গাছের সঠিক বিবরণ দিয়ে অভিমত প্রকাশ করেছেন

যে গাছের বাকলগুলি রক্তের উত্তাপ বৃদ্ধিতে ও গনোরিয়াতে ফলপ্রদ। শিকড় ব্যবহৃত হয় স্বল্প জ্বর, হাঁফানি ও গনোরিয়াতে। বক্ষরোগে ছাড়াও বাসকের পাতা আমাশয়ে উপকারী বলে গেল শতকে আমেদাবাদের সার্জন রব অভিমত প্রকাশ করেছেন।

গত শতাব্দির শেষ দিক থেকে বাসকের পাতার উপর রাসায়নিক বা ওষুধ বিজ্ঞানের গবেষণা চলেছে। জলীয় বাষ্পের সঙ্গে পাতন করলে বাসকের পাতা থেকে তেল জাতীয় পদার্থ বেরিয়ে আসে। 1888 সালে ডাঃ হুপার পাতা থেকে একটি উপক্ষার পৃথক করেছিলেন যার নাম দিয়েছিলেন ভ্যাসিসিন। সেন ও ঘোষ প্রমুখ রসায়নীগণ 1926 সাল ভ্যাসিসিনের গঠন বিন্যাস সংক্রান্ত গবেষণা আরম্ভ করেন। পরবর্তী কালে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রসায়নীগণ ভ্যাসিসিনের গঠন বিন্যাস স্থির করেন। ভ্যাসিসিন ছাড়াও পাতায় ভ্যাসিসিনের সমগোত্রীয় উপক্ষার পৃথক করা হয়েছে।

বাসকের পাতার এবং উপক্ষারের ভৈষজিক (Pharmacolgical) গবেষণা প্রথম করেন কলকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলের তদানীন্তন অধ্যাপক ডাঃ চোপরা। ভ্যাসিলিনের প্রভাবে দেহের রক্তের চাপ অল্প সময়ের জন্য একটু কমে আসে কিছুক্ষণ পরেই সেটা ফিরে আসে পুর্বের পর্যায়। ভ্যাসিসিনে ও পাতার নির্যাস কাশি তরল করে এবং ব্রঙ্কাইটিসের উপশম ঘটায়। বেলেডোনা সহযোগে এটি হাঁপানীর পক্ষে বিশেষ উপকারী। 1954 সালে ডাঃ আই. সি, চোপরা জম্মু ও কাশ্মীর ইনস্টিট্যুটে গবেষণা করে পাতা থেকে এক রকম তেল পেয়েছেন। এই তেল যক্ষার জীবাণু বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে পারে বলে তিনি দাবী করেছেন।

বাসকের কাঠ দিয়ে ভাল কাঠ কয়লা তৈরী হয়। এছাড়া পাতা থেকে এক রকমের হলদে রঙ পাওয়া যায়। বাসকের পাতা

অন্যান্য গাছ-গাছরাকে কীটপতঙ্গের হাত থেকে বাঁচায়। এজন্য বর্ষার পর চাষীরা কোথাও কোথাও ধানের ক্ষেতে বাসকের পাতা ছড়িয়ে দেয়। তাদের ধারণা সবুজের সারের কাজ ছাড়াও বাসকের পাতা ধান গাছকে পোকা মাকড়ের হাত থকে রক্ষা করে।

বেল

শ্রীফলে তুষ্ট হন মহাদেব। বেলের অন্য নাম শ্রীফল। এটা হিন্দুদের কাছে খুবই সাধারণ প্রবাদবাক্য। বিদেশী পর্যটকদের কাছেও বেলের সঙ্গে শিবের সম্বন্ধের কথা সহজেই ধরা পড়েছিল; তাই অষ্টাদশ শতাব্দির একজন ইংরেজ লেখকের লেখা থেকে জানা যায় যে বেলপাতা শিবপূজার অপরিহার্য অর্ঘসামগ্রী। ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে বা ধর্মগ্রন্থে বিল্বপত্রের অর্থাৎ বেলপাতার নানা রকমের ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইউরোপীয় লেখকগণ বেলের নাম নানা ভাবে উল্লেখ করেছেন। ষোড়শ শতাব্দিতে গার্সিয়া-দ্যা-ওরাতা বেলকে Marmelos de Bengala বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বেলের আমাশয়ে ব্যবহারের কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করেছেন। আরবীয় সেরপ্যার গ্রন্থে বেল, ফেল এবং সেল নামক তিন রকমের ফলের উল্লেখ পাওয়া যায়। খৃস্টীয় দ্বাদশ শতাব্দির বিশিষ্ট চিকিৎসক অ্যাভেগিল ফেল ও বেল সমার্থক পদ বলে বিবেচনা করেছেন। মাখজান-এত-আদিয়াতে বেলের হৃদযন্ত্রের উপর ভাল প্রভাবের কথা উল্লেখিত হয়েছে।

বেল উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এগেল মারমেলোস কেরিয়া (Aegle marmelos Correa) নামে পরিচিত। গাছগুলি 6 মিটার থেকে 7.25 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয় এবং 9 থেকে 1.25 মিটার পরিধি হয়। গাছের কাণ্ডগুলি মাটি থেকে সোজা উঠে যায় এবং ডালপালাতে কাঁটা থাকে। জঙ্গলা ভাবে অনেক জায়গায় গাছগুলি পাওয়া যায় আর অনেক জায়গায় বেলগাছের চাষ হয়। সমগ্র উপহিমালয় অঞ্চলে, মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের অনেক জায়গাতে বেল গাছ বেশ জন্মায়। উত্তর ভারতে বেল গাছের চাষ হয়। অঞ্চল বা রাজ্য অনুসারে ফলের আকার ভেদ দেখা যায়। বেলের পাতাগুলি একসঙ্গে তিনটি করে থাকে।

মার্চ থেকে এপ্রিলের মধ্যে ফুল ফোটে এবং ফলও ফলতে আরম্ভ করে। ফলগুলি ডিসেম্বর থেকে পাকতে সুরু করে। অনেক সময় জুন মাস পর্যন্ত ফল পাওয়া যায়। পাঁচ থেকে আট বছর বয়স থেকে গাছগুলি ফল দিতে থাকে। তবে 25 থেকে 30 বছরের গাছগুলি পূর্ণ ফলবতী পর্যায়ে আসে।

বেলগাছের বাকল থেকে কষ বের করা হয় এবং এই কষ আঠা-আঠা হয়ে যায়। পরিমাণে এই আঠা বেশ কম হয়। বীজ থেকে সবচেয়ে বেশী আঠা পাওয়া যায়। গত শতকে এই আঠা ব্যবহৃত হত সিমেণ্ট ও রঞ্জক দ্রব্যের ঔজ্জ্বল্য বাড়াবার জন্য। ওয়াট উল্লেখ করেছেন যে যোগীগণ ফলের মণ্ড তেলের পরিবর্তে ব্যবহার করেন। একটি ফল উনুনে উত্তপ্ত করে ফাটিয়ে নিয়ে জলের সঙ্গে মিশিয়ে মণ্ড তৈরী করা হয়। সেই মণ্ড সন্ন্যাসিগণ সারা গায়ে মেখে স্নান করেন এতে নাকি শরীর খুব স্নিগ্ধ হয়।

ভেষজ হিসাবে বেলগাছের বিভিন্ন অংশের নানা গুণের কথা উল্লেখিত আছে। বেলের শিকড়ের ছাল দশমূলারিষ্টের একটা বিশেষ উপাদান। পাতার রস চোখের অসুখ ও নানা প্রকার ক্ষতে ব্যবহৃত হয়। এই রস বেশ তেতো ও ঝাঁজাল। জ্বর, সর্দি ও পিত্তাধিক্যে রস জ্বাল দিয়ে খাওয়ান হয়। সাধুগণ বেলপাতা চিবিয়ে খান সংযত জীবনের সহায়ক বলে। এতে খাওরার ইচ্ছা বেশ কমে আসে।

বেলের রাসায়নিক গবেষণা বলতে গেলে আরম্ভ হয়েছে 1930 সাল থেকে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিখিভূষণ দত্তই প্রথম এই কাজে অগ্রণী হয়েছিলেন। পরবর্তীকালের রাসায়নিক গবেষণার বেশির ভাগই সম্পাদিত হয়েছে প্রথিতযশা রসায়নী ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের তত্ত্বাবধানে। এই গাছ থেকে কয়েকটি কুমারীণ জাতীয় যৌগ, উপক্ষার ও ষ্টেরল পৃথককৃত হয়েছে। এছাড়া লক্ষ্ণৌ এর জাতীয় ভেষজ

গবেষণাকেন্দ্র থেকে কিছু গবেষণা হয়েছে। তাতে সোরালিন জ্যান্থটক্সিন নামক শ্বেতীরোগে কার্যকরী যৌগ পৃথক করা হয়েছে।

সেজন্য পাকা বেল শ্বেতীরোগীর পক্ষে গ্রহণীয়। কিন্তু এই ব্যবহার সাবধানের সঙ্গে করা উচিত কারণ অনেক সময় সোরালিন জাতীয় ওষুধ অনেক রোগীর অসুখ বাড়িয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে প্রথম পরীক্ষা করে নেওয়া প্রয়োজন অল্প পরিমাণ পাকা বেল খেয়ে শ্বেতী রোগ বেড়ে যাচ্ছে কিনা। বেড়ে গেলে সেই রোগীর পক্ষে পাকা বেল গ্রহণীয় নয়। ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের গবেষণাগার থেকে যে সব যৌগ পৃথক করা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে আম্বেলিফেরণ, ইম্পেরোটেরিন, মারমেলোসিন, অ্যালোইম্পেরোটেরিন, মারমেসিন, মারমিন এবং আরও কয়েকটি উপক্ষার। মারমেলোসিন কোষ্ঠ পরিষ্কারক ও মূত্রবৃদ্ধিকারক। মারমেসিন, আম্বেলিফেরণ, মারমিন, সোরালিন, জ্যান্থোটক্সিন এর খানিকটা ছত্রাক রোধ করবার ক্ষমতা আছে। এটা চক্রবর্তী, দাশগুপ্ত, ও বসু দেখিয়েছেন। ফসলের খোসা থেকে এক রকম হলদে রং পাওয়া যায়।

ভারতীয় অ্যাকোনাইট

অ্যাকোনাইট কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ অ্যাকোয়ান থেকে। এর ব্যুৎপত্তি অর্থ হচ্ছে তীব্র। হিন্দু ভেষজবিদদের কাছে অ্যাকোনাইট অতি বিষ নামে পরিচিত। বিভিন্ন রকম উপসর্গে বেদনানাশক ও জ্বর প্রতিরোধক হিসাবে অ্যাকোনাইট ব্যবহৃত হয়। সুশ্রতসংহিতা অনুবাদের পর আরবীয় ফারমাকোপিয়াতে অ্যাকোনাই বিষ। (বিখ) বলে গৃহীত হয়েছিল। আরবীয় বিশারদদের মধ্যে আবু বইথর প্রথম উল্লেখ করেন যে বিষ নামক গাছ ভারতে উৎপন্ন হয়। এছাড়া কয়েকটি আরবীয় গ্রন্থে অ্যাকোনাইটকে হলাহল বলা হয়েছে। একটা সরিষার পরিমাণ হলাহল একজন মানুষকে মেরে ফেলার পক্ষে যথেষ্ট। ইসবেন আলি নামক একজন গ্রন্থাকার উল্লেখ করেছেন যে হলাহল তেহরী গাড়ওয়াল ও তার পূর্ব অঞ্চলে উৎপন্ন হয়। আধুনিক পর্যটকদের মধ্যে বুকানন হ্যামিলটনের অ্যাকোনাইট সংক্রান্ত বিবরণ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। 1802 খৃস্টাব্দে হ্যামিলটন নেপালের এক বিবরণীতে উল্লেখ করেছেন যে গুর্খাগণ বাইরের শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য অ্যাকনাইটের শিকড় ব্যবহার করে নদীর জল বিষাক্ত করে দিত। এর ফলে বহিশত্রুর জল সরবরাহ ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হত।

অ্যাকোনাইট আসলে আকোনিটাম লিন্ (Aconitum Linn.) গণের বিভিন্ন প্রজাতিকে বলা হয়। এই গোষ্ঠি র‍্যানানকুলাসী গোত্রের অন্তর্গত। জর্জ ওয়াট প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতীয় অ্যাকোনাইটের যথাযথ শ্রেণীবিন্যাসের প্রয়োজন। 1905 সালে স্ট্যাফ (Staff) ভারতীয় অ্যাকোনাইটের শ্রেণীবিন্যাস করেন।

পৃথিবীর 110টি প্রজাতির মধ্যে অ্যাকানিটাম গোত্রিয় 24টি প্রজাতি ভারতে উৎপন্ন হয়। ষ্ট্যাফ্ এগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করেন।

(1) যে গাছগুলি এক বছর বাঁচে সেগুলিকে বলা হয় জিমনেকোনিটাম।

(2) যেগুলি কয়েক বছর বাঁচে তাদিগকে বলা হয় আইকো-কোনটাম।

(3) আর যেগুলি দু'বছর বাঁচে সেগুলি নেপেলাস শ্রেণীর বলে গণ্য করা হয়। নেপেলাস শ্রেণীর আবার কয়েকটি উপরিভাগ আছে। ষ্ট্যাফের শ্রেণী বিভাগ বিশেষ কার্যকরী কিন্তু তাও নির্ভুল নয়। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীবিন্যাস সংশোধন করেছেন অধ্যাপক হীরালাল চক্রবর্তী 1954 সালে।

অ্যাকোনাইট গাছগুলি প্রায়ই জন্মে হিমালয় অঞ্চলের 1800 থেকে 4000 মিটার উঁচু এলাকায়। কাশ্মীরের কুমায়ুন, হাজারা অঞ্চল, নেপাল ও সিকিম অঞ্চলে এইসব বনৌষধি জন্মে। ভারতের বাজারে যে ভেষজ অ্যাকোনাইট বলে বিক্রি হয় সেটা হচ্ছে অ্যাকোনিটাম গোষ্ঠির বিভিন্ন প্রজাতির শিকড়। ভারতের চব্বিশটি প্রজাতির মধ্যে তেরটি ভেষজ হিসাবে মূল্যবান। এই তেরটির মধ্যে প্রধাণতঃ পাঁচটি প্রজাতির বাজার কেনা বেচা চলে। এগুলি হচ্ছে অ্যাকোনিটাম হেটেরোফাইলাম, অ্যাকোনিটাম চ্যসমান্থাম, অ্যাকোনিটাম ফেরক্স, অ্যাকোনিটাম লাইকোক্টানাম এবং অ্যাকোনিটাম নেপেলাস। ফেরক্স প্রজাতি বলে যেটা বাজারে প্রচলিত সেটা আসলে বেলফুরি ও স্পিকাটাম প্রজাতির সংমিশ্রণ।

অ্যাকোনিটাম হেটেরোফাইলাম হচ্ছে অ্যাকোনিটাম গোষ্ঠির সবচেয়ে পুরান ব্যবহৃত প্রজাতি। জ্বর ও স্নায়বিক রোগের বিরুদ্ধে

এই ভেষজ ব্যবহৃত হয়। পেটের পীড়া এবং আমাশায়ে হেটেরো-ফাইলাম ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বাজারের হেটেরোফাইলাম প্রজাতিতে শতমূলি ভেজাল হিসাবে মেশান হয়। ফেরক্স প্রজাতি ভারতের বাইরে ভারতীয় অ্যাকোনাইট বলে পরিচিত। ভারতের বাজারে যে ফেরক্স বিক্রি হয় তা ডিনেরিয়াম, বেলফুরী ও স্পিকাটাম প্রজাতির সংমিশ্রণ এই প্রজাতির শিকড় ব্যবহারের পূর্বে আয়ুর্বেদ চিকিৎসকগণ গোমূত্রে কিংবা দুধের মধ্যে ভিজিয়ে রাখার নির্দেশ দেন। এর ফলে বনৌষধির হৃদযন্ত্রের উপর বিষক্রিয়া অনেকটা কমে আসে। দুধে ভিজিয়ে রাখলেই ফল বেশী ভাল হয়। তীরের বিষ হিসাবে এই প্রজাতির ব্যবহারের উল্লেখ আছে। অ্যাকোনিটাম চ্যাসাম্যানথাম ও ইউরোপীয় অ্যাকিনোটিম নেপেলাস্ দেখতে প্রায় একই রকম। পূর্বে এই প্রজাতি ভারতীয় নেপেলাস প্রজাতি বলে বলা হত। এতে উপক্ষারের ভাগ বেশী থাকলেও দেহের উপর কার্যকারিতা অনেক কম।

পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সমভূমিতে অ্যাকোনাইটের সরবরাহ হয় পাহাড়ীদের সাহায্যে। হিমালয়ের কাশ্মীর ও হাজারা অঞ্চলের অ্যাকোনাইট অমৃতসরে আসে। এর মধ্যে চ্যাসামেনথাম ও হেটেরো-ফাইলাম প্রজাতিই বেশী। মধ্য হিমালয়ের সরবরাহে থাকে বেশী পরিমাণ বেলফুরীও ডিনোরিয়াম প্রজাতি। এগুলো আসে লক্ষ্ণৌ ও দিল্লি অঞ্চলে। নেপাল অঞ্চলের অ্যাকোনাইটে স্পিকটাম ও ল্যাস্মিনিয়াটাম প্রজাতিরই প্রাধান্য। এই মালগুলি দাৰজলিঙ ও কলকাতার বাজারে আসে।

ভারতীয় অ্যাকোনাইটের উপক্ষার সংক্রান্ত গবেষণায় প্রথম দিকে নজর সিং এর কাজ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের অ্যাকোনিটাম গোষ্ঠির উপক্ষারের গঠন বিন্যাস ভারতের বাইরেই স্থির হয়েছে বেশী। এই প্রসঙ্গে ক্যানাডার অধ্যাপক ভিসনারের নাম অগ্রগণ্য। অ্যাকোনাইট

উপক্ষারের গবেষণায় বিশুদ্ধ রসায়নের জ্ঞান বিশেষভাবে সমৃদ্ধ হয়েছে। সাধারণতঃ মূল 0.38% থেকে 0.81% উপক্ষার থাকে, একমাত্র চ্যাসমানথেম প্রজাতিতে 4.5% উপক্ষার থাকে। অ্যাকনাইট গোষ্ঠির উপক্ষার ডাইটার্পিন গোষ্ঠির গঠন বিন্যাস যুক্ত। উপক্ষার গুলির মধ্যে অ্যাকোনিটিন, ইন্দোঅ্যাকোনিটিন, অ্যাটিসিন, লাইকোকটিনিন, হোটেরোঅ্যাটিসিন উপক্ষারগুলি অন্যতম। অ্যাকোনাইট উপক্ষার-গুলির অনেকগুলি আবার বিষক্রিয়া শূন্য যেমন অ্যাটিসিন। হেটেরো-ফাইলাম প্রজাতিতে এই উপক্ষার বর্তমান।

অ্যাকনাইট গোষ্ঠির উপক্ষারের উপর চোপরার ওষুধ বিজ্ঞানের গবেষণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অ্যাকোনিটাম উপক্ষারের প্রভাবে প্রথমে স্নায়ুমণ্ডল সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে, পরে এর প্রভাবে স্নায়ুমণ্ডল অবশ হয়ে পরে। দেহের ভিতর বা বাইরে স্নায়ুমণ্ডলের অগ্রভাগের কার্যকারিতার ব্যাঘাত ঘটায়। অল্প পরিমাণে হৃদযন্ত্রের উপর কোনও বিষক্রিয়া দেখা যায় না। বেশী পরিমাণের প্রভাবে নাড়ীর গতি ক্ষীণ হয়ে আসে। মালিশ হিসাবে ব্যবহারেও যথেষ্ট বিপদ আছে। যদি ত্বকের অবস্থা সম্পূর্ণ সুস্থ না থাকে তবে অনেকটা ভেষজ শোষিত হয়ে বিপদ সৃষ্টি করতে পারে। তিন মিলিগ্রাম অ্যাকোনিটেনের প্রভাবে একটি ঘোড়া মারা যায়। অ্যাকোনাইট গোষ্ঠির বিষক্রিয়া সম্পন্ন যৌগগুলির বিষক্রিয়া প্রায় একই রকমের।

বাজারে যে সব অ্যাকোনাইট কেনা বেচা চলে তার মধ্যে ফেরক্স, চ্যাসমেনথাম প্রজাতি ইউরোপীয় নেপেলাসের সমকক্ষ। ভারতের বাজারের মাল সব সময় প্রামাণিক নয় কারণ অনেক সময় বেশ ভেজাল থাকে। রপ্তানি বাণিজ্যের পক্ষে এটা বেশ ক্ষতিকর।

রসুন

ভারতবর্ষে রসুনের চাষ অনেকদিন থেকেই হয়ে আসছে। দ্রব্যগুণবিদ্ পণ্ডিতগণ রসুনকে রসেন নামে অভিহিত করেছেন। তাঁদের মতে রসুনের মধ্যে মধুর, লবণ, তিক্ত, কটু ও কষার এই পাঁচটি রস বর্তমান। তাঁরা মনে করেন রসুনের মূলে কটুরস, পাতায় তিক্ত রস, নলে কষার রস, নলের ডগায় লবণ রস এবং বীজে মধুর রস থাকে। এর মধ্যে নাই কেবল অম্লরস সেজন্যে এর নাম রসেন। পৃথিবীর নানা দেশে সব্জী বা মশলা হিসাবে রসুন ব্যবহৃত হয়। এছাড়া প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র থেকে আরম্ভ করে আধুনিক নানা ধরণের চিকিৎসা পদ্ধতিতে রসুন নানারকম শারীরিক উপসর্গে ব্যবহৃত হয়। আসলে রসুন পেঁয়াজের মত ভারতীয় মশলার অন্যতম অঙ্গ। রসুন সব্জি ও চাটনি প্রভৃতি সুস্বাদু করার জন্য প্রধাণতঃ ব্যবহৃত হয়।

লিলিয়াসি গোত্রের অ্যালিয়াম গোষ্ঠির অন্যতম প্রজাতি রসুন। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে এই গুল্ম অ্যালিয়াম স্যার্টিভাম লিন্ (Allium sativum Linn.) নামে পরিচিত। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় এর বিভিন্ন নাম। সংস্কৃত ভাষায় অরিস্ট, বাংলাভাষায় রসুন, মলয়ালামে তেলেগাদা, তামিল ভাষায় ভেল্লাই পুণ্ডু আর কানাড়ীতে বেল্লুলি নামে অভিহিত হয়। ইংরাজীতে রসুনকে গারলিক বলা হয়।

রসুন গাছ বেশ কয়েক বছর বাঁচে। গাছগুলি পেঁয়াজের মত গুল্ম শ্রেণীর। কন্দ থেকে পাতাগুলি সোজা উঠে আসে। রসুনের কন্দগুলি পেঁয়াজের মত বড় হয় না। অনেক সময় ছোট বড় কন্দ মিশে থাকে। কন্দগুলির খোসার রং সাদা কিংবা একটু লালচে। পাতার উপর অংশে ফুল হয়। রসুনের গন্ধ পেঁয়াজের গন্ধ থেকে তীব্রতর।

থিয়ামিন নামক আর একটি যৌগ রসুন থেকে আলাদা করা হয়েছে। অ্যালিসিন গ্রাম-পজিটিভ ও গ্রাম-নেগেটিভ জীবাণু বৃদ্ধি প্রতিরোধ করতে সক্ষম। রসুন থেকে নোবেল বিজয়ী রসায়নী ফিয়ারটেনেন নয়টি গ্লুটমিক অ্যাসিড গোষ্ঠির পেপটাইড পৃথক করেছেন। এর মধ্যে এস-মিথাইল সিসটিন সালফোক্সাইড এবং এস-এন-প্রোপাইল সিসটিন সালফোক্সাইড ছাড়া অন্যান্যগুলি পেঁয়াজে পাওয়া যায়।

1953 সালে তদানীন্তন লাক্ষ্মৌ এর সেন্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ল্যাবোরেটরীর অধিকর্তা ডাঃ বি. মুখার্জি রসুনের ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে ক্ষয়রোগ, ব্রঙ্কাইটিস, শ্বাস যন্ত্রের ক্ষত, স্বর যন্ত্রের ক্ষত প্রভৃতি রোগে রসুনের রস ব্যবহার করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া ডাঃ মুখার্জি মালিশ ও পুলটিস হিসাবে বিভিন্ন রোগে এর ব্যবহারের কথা উল্লেখ করেছেন। শিশুদের উপর রসুনের ব্যবহার বিশেষ বিপজ্জনক। ভারতীয় ফার্মাকোপিয়াতে সিরাপ অ্যালির বিধি লিপিবদ্ধ আছে। অ্যাসিটিক অ্যাসিড, বিশুদ্ধ জল ও চিনি দিয়ে একটি মিশ্রণ তৈরী করতে হবে এবং পরিমিত মাত্রায় রসুনের রস মিশিয়ে সিরাপ অ্যালি তৈরী করা হয়। এতে থাকবে 2 আউন্স রসুনের রস, 8 আউন্স চিনি, 2 আউন্স অ্যাসিটিক অ্যাসিড আর বিশুদ্ধ জল 2 আউন্স।

রাধুনী

ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে রাধুনী স্যালাড হিসাবে ব্যবহৃত হয়। রাধুনীর আদি বসতি ইংলণ্ডে। বেশী পরিমাণ রাধুনী গাছ চাষ ফ্রন্সে হয়। এছাড়া এর চাষ আমেরিকা বা ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় হয়ে থাকে। ভারতে কোনও কোনও অঞ্চলে রাধুনি গাছের চাষ হয়।

উদ্ভিদ বিজ্ঞানে রাধুনী এপিয়াম গ্রাভিওলেনাস ভার ডুলস ডিসি (Apium graveolens var dulce DC) নামে পরিচিত। আমবেলিফেরি গোত্রের অন্তর্গত এই গুল্ম। গাছগুলি ·6 থেকে ·9 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। এর ফলগুলি ছোট আকারের 1·15 মিলি মিটার × 1 মিলি মিটার। এই ফলের ভিতর বীজ থাকে। ভারতবর্ষের রাধুনির বীজ যা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে মশলা হিসাবে ব্যবহৃত হয় বাজারে রাধুনী বলে পরিচিত। শীতের দেশে কিংবা পার্বত্য অঞ্চলে গাছ দ্বিবর্ষজীবী। সেখানে দ্বিতীয় বর্ষে ফল দেয়। অন্যান্য জায়গায় গাছটি বর্যজীবী এবং প্রথম বছরেই ফল দেয়। শীতল আর্দ্র আবহাওয়া এই গাছের পক্ষে অনুকূল। দোয়াস মাটি এই গাছের পক্ষে ভাল এবং কর্দমাক্ত মাটি এর পক্ষে অনুপযুক্ত। ভাল ফসলের জন্য জমিতে সার দেওয়া এবং বেশ কয়েকবার নিড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন আর প্রয়োজন হচ্ছে অপর্যাপ্ত জল। সে জন্য সেচন অপরিহার্য। বাগানের ফসল হিসাবে চাষের জন্য পার্বত্যভূমিতে বীজগুলি মার্চ থেকে এপ্রিল মাসে বোনা হয়। মে মাসে চারাগুলি রোপণ করা হয়। নভেম্বর ডিসেম্বরের মধ্যেই ফলন আরম্ভ হয়। পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সমভূমিতে চারাগুলি এনে সেপ্টেম্বর থেকে অক্টোবরের মধ্যে রোপণ করা হয়। এর তিন মাসের মধ্যে ফল ধরে। পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশের কোনও কোনও

অঞ্চলে মলভূমিতে রাধুনির চাষ হয়। এক হেক্টর জমিতে 750 থেকে 800 কেজি ফল উৎপন্ন হয়। রাধুনী কতগুলি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হতে পারে এর মধ্যে আর্লি ব্লাইট, লেট ব্লাইট বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া বাগানের কতকগুলি পতঙ্গ এই গাছের পরম শত্রু। ভারতবর্ষে রাধুনির বীজ ছাড়াও ইউরোপীয় পদ্ধতিতে খাবারের সঙ্গে রাধুনীর ডাটা ও পাতা স্যালাড হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

রাধুনীর শুকনো পাকা বীজের, উদ্দীপক ও স্নায়ু মণ্ডলের টনিক হিসাবে ব্যবহারের নজির আছে। বাতে রাধুনীর নিষ্কাশন ব্যবহৃত হয়। রাধুনীর চর্বিজাতীয় তেল অ্যান্টি স্পাসমোডিক। অন্ত্রের জীবাণু বৃদ্ধি রোধে রাধুনি বিশেষ কার্যকরী বলে সমাদৃত। দেহের মলমূত্র বৃদ্ধি কারক এবং শূল ব্যাথায় রাধুনি কার্যকরী বলে গেল শতকের ডঃ কানাইলাল দের তাঁর ভারতীয় বনৌষধিতে উল্লেখ করেছেন।

রাধুনীর রাসায়নিক পরীক্ষাতে দেখা যায় যে পাতাতে শতকরা 81 ভাগ জল, শর্করা জাতীয় পদার্থ 8·6%, তৈল জাতীয় গদার্থ 0·6%, প্রোটিন 6·0%, ক্যালসিয়াম 0·23%, ফসফরাস 0·14%, লৌহ 73 মিলিগ্রাম%, ভিটামিন এ 5800 থেকে 7500 আন্তর্জাতিক একক। এর মূলে খানিকটা আর্সেনিক ও তামা আছে। রাধুনি থেকে অ্যাপিন নামক ফ্লাভানয়েড গোষ্ঠির যৌগ পাওয়া যায়। এছাড়া গ্লাইকোলিক অ্যাসিড এর অন্যতম উপাদান। গ্লাইকোলিক অ্যাসিড মূত্রবৃদ্ধি কারক। রাধুনীর ফলে 2-3 ভাগ ফিকে হলদে উদ্বায়ী তেল আছে। এই তেল বাজারে 'সিলারি' বীজ তেল নামে পরিচিত। এই তেলের প্রধান উপাদান হচ্ছে লিমোনিন, সেলিনিন, সেডানোসিক অ্যাসিড এবং সোডানোলইড। শেষোক্ত দুটি উপাদানের উপর উদ্বায়ী তেলের সুগন্ধ নির্ভর করে।

সুপারি

নিত্য ব্যবহার্য মশলা ছাড়াও উৎসব ও নানা শুভকাজে ব্যবহৃত হয়ে ভারতীয় সমাজ জীবনে সুপারি বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। বিয়ের আগে হলুদ কোটায় এয়োদের মধ্যে পান সুপারি আর বাতাসা বিতরণ চিরাচরিত প্রথা। পুরাকালে দু'জন রাজপুতের মধ্যে একজন আর এক জনকে দন্দ্ব যুদ্ধে আহ্বান করত রাজদরবারে সুপারি ছুড়ে দিয়ে। মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে শুধু ভারতবর্ষেই নয় চীন দেশেও সুপারির বেশ কদর ছিল। চীন দেশে সুপারি অতিথিদের আপ্যায়নে ব্যবহৃত হত এজন্য এর নাম পিনলাভ। পিন কথাটার অর্থ হচ্ছে অতিথি, তা থেকেই সুপারির নাম 'পিনলাভ' এসেছে।

সুপারি গাছের আদি বসতি মালয় বলেই বিবেচিত। ভারত ও মালয়েই এই গাছ বেশী জন্মে। তবে এশিয়ার অন্যান্য উষ্ণ অঞ্চলেও এই গাছ জন্মান হয়েছে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানে সুপারি অ্যারেকা ক্যাটাচু লিন্ (Arcea catechu Linn.) নামে পরিচিত। এটি পামগোত্রের অর্ন্তভুক্ত। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সুপারি বিভিন্ন নামে পরিচিত। আমরা ফলটাকেই সুপারি বলি। ইংরাজীতে এর নাম বিটাল নাট (Betal nut) বা অ্যারেকা নাট (Arcea nut)।

সুপারি গাছ সাধারণতঃ সরু এবং প্রায় 12 থেকে 18 মিটার পর্যন্ত লম্বা হয়। চূড়া সবুজ পত্রগুচ্ছ দ্বারা শোভিত।

সুপারির খোসা বেশ শক্ত আঁশযুক্ত ও সবুজ। যখন ফল পাকতে শুরু করে তখন খোসাটা হলদে হতে থাকে, পরে সেটা ধূসর বর্ণে দাঁড়ায়। এই ফলের ব্যাস সাধারণতঃ 250 থেকে 3·75 সেমি.।

যদিও সুপারির আদি বসতি মালয় বলে বিবেচিত হয়, এর চাষ চলে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার, ফিলিপাইন ও ভারতের সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে বিশেষ করে বঙ্গোপসাগরের উপকূলবর্তী অঞ্চলে। ভারতবর্ষে আসাম, মাদ্রাজ, মহীশূর, এবং মহারাষ্ট্রের কেলাবা, থানা, কানারা ও গোয়া অঞ্চলে সুপরি জন্মায়। সমুদ্র উপকূলের বালি ও নোনামাটি সুপারি চাষের অনুকূল হলেও সমুদ্র থেকে 400 কিলোমিটার দূরে অথবা সমুদ্র থেকে 900 মিটার উঁচু অঞ্চলেও সুপারির গাছ জন্মাতে দেখা যায়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসামে বেশী পরিমাণ সুপারি পাওয়া যায়। মাটি ও জাতের উপর নির্ভর করে সুপারির স্বাদ ও আকার। আর্দ্র ও উষ্ণ আবহাওয়া সুপারি চাষের অনুকূল। গাছ বাড়বার সময় আর্দ্র আবহাওয়া বিশেষ প্রয়োজন। সেজন্য যে সব জায়গায় বৃষ্টি হয় সেখানে গাছগুলি ভাল জন্মায়। তাবে জলের প্রাচুর্যের সঙ্গে সঙ্গে চাই দ্রুত জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা। বাড়বার সময় আরেকটা প্রয়োজন সুপারি গাছের সেটা হচ্ছে ছায়া। তাই অঞ্চল ভেদে কোথাও কোথাও মাদার গাছ বা পানের বরজ দিয়ে ছায়া তৈরী করা হয়। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের কাদামাটি, কালোমাটি, বালিমাটিতেও এগাছ জন্মে।

মহীশূরের সুপারি চাষের পদ্ধতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এখানকার চাষের পদ্ধতি সমস্ত দক্ষিণ ভারত ও পশ্চিম অঞ্চলে প্রচলিত। মহীশূরের পার্বত্য অঞ্চল এবং সমভূমির সব জায়গাতেই সুপারির চাষ হয়। পাহাড়ের কাছে বনের পাশে এবং সমভূমিতে জলা কিংবা নদীর ধারে বাগান তৈরী করা হয়। সুপারির ফল শুকিয়ে নিয়ে সুপারির চারা তলায় বুনে দেওয়া হয়। প্রায় দু'বছর পরে অঙ্কুরিত চারা রোপণের উপযুক্ত হয়। সাধারণতঃ এক হেক্টর জমিতে 1000 বৃক্ষ রোপণ করা হয়। বিশ বছর বাদে আবার নতুন চারা বুনে দেওয়া হয়। সুপারির সারিগুলি থেকে মাঝে মাঝে বুড়ো কিংবা অকেজো গাছগুলিকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এজন্য পুরানো

বাগানে এক হেক্টর জমিতে 2000 থেকে 3000 গাছ দেখতে পাওয়া যায়। বর্ষার আগে সুপারির চারার মূলগুলি খুঁড়ে মাটি, পাতা ইত্যাদি দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয় যাতে জল এলে মাটি ধুয়ে গাছগুলির মূল বেরিয়ে না পড়ে।

মহীশূরে অনেক যত্ন নেওয়া হয় সুপারি চাষের জন্য পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে যত্ন অনেক কম নেওয়া হয়। অধুনা বাংলাদেশের বরিশাল, ত্রিপুরা, ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রংপুর জেলায় সুপারি প্রচুর পরিমাণে জন্মে। মহীশূরে সুপারি গাছের ফসল ফলতে থাকে রোপণের দশ বছর থেকে বার বছর বাদে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা বাংলাদেশে কোথায় কোথায়ও ছয় থেকে সাত বছর পর থেকেই ফসল ফলতে দেখা যায়। ত্রিশ বছরে সুপারির ফসল বেশী দাঁড়ায় এবং সাধারণতঃ 30 থেকে 60 বছর পর্যন্ত এইরকম চলে। একটা সুপারি গাছের আয়ু ষাট থেকে একশ বছর। মহীশূরে এক হেক্টর জমিতে প্রায় 1700 সুপরি জন্মে।

এই হেক্টর জমিতে পঁচিশ লরী মাঠের সার প্রয়োজন। এছাড়া 800 কেজি চীনাবাদামের খৈল, অ্যামোনিয়াম সালফেট, সুপার ফসফেট, পটাসিয়াম সালফেট বিশেষ উপযোগী। অনেক ক্ষেত্রে সবজ সার প্রয়োগ করে বিশেষ ফল পাওয়া যায়।

মহীশূরে সাধারণতঃ দু-রকম রোগে সুপারি গাছগুলি আক্রান্ত হয়। একটা রোগ কোলে রোগে (Kole roga)। কোলে রোগে (Kole roga) ফাইটোপথেরা মূনিভোরা ভার এরেসোয়ি (Phytopthera minivora var arecoe) এবং দ্বিতীয়টি আনাবারোগে (Anabe roga) গ্যানে ডারমা লুসিডাম লেইস এক্স ফ্যারা (Ganoderma lucidum Leyse ex Fabr) নামক দুটো ছত্রাক দ্বারা পরিবাহিত হয়। কোলে রোগের প্রভাবে অপরিপক্ক সুপারি পচে গাছ থেকে পড়ে যায়। যদি বেশী দিন ধরে এই রোগ থাকে তবে গাছ

মরে যায়। কেরোসিনের সংমিশ্রণে বোর্ডো মিকশ্চার ছড়িয়ে এই ছত্রাকের আক্রমণ থেকে গাছ রক্ষা করা যায়। আনাবা রোগের প্রভাবে মূল ও কাণ্ডের নীচু অংশ আক্রান্ত হয়। এই রোগের লক্ষণ হচ্ছে চূড়ার বৃদ্ধি কমে পাতাগুলি হলদে হতে থাকে। অনেক সময় বড় বড় গাছও এর প্রভাবে মরে যায়। এর জন্য রোগগ্রস্ত অংশ সরিয়ে সেখানে খানিকটা গন্ধক ছড়ান হয়। যে মাটিতে চুনের পরিমাণ বেশী সেখানেই রোগটা হয়।

সুপারির ফল সংগ্রহ করে রেখে কিছুদিন পরে গোটা ফল থেকে বা দু-টুকরো করা ফল থেকে খোসা ছাড়িয়ে ফেলে জলে সিদ্ধ করা হয়। এই জলের মধ্যে আগের বারের নিষ্কাশনও খানিকটা মেশান হয়। এই নিস্কাশন ছোগাড় নামে পরিচিত। দেড় থেকে তিনঘণ্টা পর্যন্ত সুপারিগুলি সিদ্ধ করা হয় তামার বা মাটির পাত্রে। এরপর শাঁসগুলি শুকিয়ে বাজারে বিক্রি করা হয়। বিভিন্ন রকম সুপারির মধ্যে রামচন্দ্রপুরের জাত আর দেশবর জাতের কদর বেশ বেশী।

দ্রব্যগুণবিদ্ পণ্ডিতগণ সুপারিকে গুরু, শীতবীর্য, রুক্ষ, কফঘ্ন, পিত্তনাশক, মদকারক, অগ্নিদীপক, রুচিকারক এবং মুখের বিরসতা নাশক বলে অভিহিত করেছেন। অপক্ক সুপারি তাদের মতে দৃষ্টি নাশক। আয়ুর্বেদে নানারকম ব্যবহার ছাড়াও কামেশ্বর মোদকের উপাদান হিসাবে সুপারির বিশেষ প্রয়োগ আছে।

সুপারির প্রধান ব্যবহার পানর অন্যতম উপকরণ হিসাবে। পানের সহউপকরণ হিসাবে খয়ের, চুনের মত সুপরি অন্যতম। সমগ্র ভারতবর্ষে ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে পানের সঙ্গে সুপারির ব্যবহার প্রচলিত। সাধারণতঃ মনে করা হয় সুপারি দন্তক্ষয় রোধ করে। কিন্তু চোপরার মত হচ্ছে বেশী পান খেলে মুখে দূষিত ক্ষতের সম্ভাবনা থাকে, এমনকি এর প্রভাবে ক্যানসার পর্যন্ত হতে পারে। তবে আধুনিক গবেষণার ফল

থেকে জানা যায় যে পান চিবানো অভ্যাস থেকে সরাসরি ক্যানসার হয় না। পানের সঙ্গে যে সব যৌগ আছে তাদের অবক্ষয়ের ফলে ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ তৈরী হতে পারে। কাঁচা সুপারির প্রভাবে মাথা ঝিম ঝিম করা, মাথা ধরা প্রভৃতি উপসর্গ দেখা দেয়। সুপারি পুড়িয়ে অনেক সময় দাঁতের মাজন তৈরী করা হয়। সুপারির সবুজ ছোবড়া থেকে ট্যানিন জাতীয় পদার্থ পাওয়া যায়। গ্রামে সুপারি গাছের কাঠ ব্যবহৃত হয় ঘরের বাটাম, থাম ইত্যাদি তৈরীর জন্য। সুপারি গাছের ডোঙা বিভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয় ঘরকন্নার কাজে।

সুপারির রাসায়নিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে এতে জল 30·3%, প্রোটিন 4·7%, চর্বিজাতীয় পদার্থ, 4% শর্করা 47·0%, অজৈব পদার্থ 1%, ক্যালসিয়াম 0·06%, ফসফরাস 0·13%, আয়রন 1·5 মিলিগ্রাম%। সুপারিতে 0·1 উপক্ষার এবং 14% ট্যানিন আছে। এছাড়া রঞ্জন দ্রব্য ও খানিকটা তৈলজাতীয় পদার্থ আছে। এতে পাঁচটি পিরিডিন গোষ্ঠির উপক্ষার আছে। এদের নাম হচ্ছে অ্যারেকোলিন, আরেকোডিন,অ্যারেকোলিডিন, গুভ্যাসিন এবং গুভ্যাকোলিন। এর মধ্যে অ্যারেকোলিনের শরীরের উপর বিষক্রিয়া আছে। অ্যারেকোলিনের প্রভাবে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। এছাড়া সুপারিতে ক্যাটিচিন গোষ্ঠির দুটি যৌগ আছে।

ভারতে যে পরিমাণ সুপারি উৎপন্ন হয় তা দেশের চাহিদার তুলনায় কম বলে স্ট্রেটসেটেলমেণ্ট, সিংহল, জাভা প্রভৃতি দেশ থেকে মাল আমদানি করা হয়। তবে মালের গুণগত বৈষম্যের জন্য কিছু কিছু মাল রপ্তানি হয়।